সারা বছরের
আনন্দ ও সুখের
স্মৃতি সঞ্জীবিত
রাখিবার মানসে

নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি

....

....

উপহার

দিলাম

শারদীয়া ১৩৩২

নিবেদন

"নিরুপমার" কর্ত্তৃপক্ষগণ বাণীপূজার যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতে পৌরহিত্য করিবার যোগ্যতা আমার নাই! বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিল্পীবৃন্দের রচনা ও চিত্র সম্ভারে হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কার্য্য, ইহা ভালরূপে জানি; কিন্তু মায়ের পূজার ফুল ও অর্ঘ্যগুলি থালায় সাজাইয়া দিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য যখন আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে, তখন তাহা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। সকলের স্নেহ-ভালবাসা এবং এই দীন পূজারীর অন্তরের ভক্তি—এই দুইটীর ভরসায়ই, এই পবিত্র কার্য্যে হাত দিলাম।

গল্প ও চিত্রাদি এত বিলম্বে হস্তগত হইয়াছে যে সেগুলিকে ইচ্ছামত সাজান বা গোছানর সময় বড় ছিল না; কোন রকমে ছাপিয়া বাহির করাই সম্পাদনের কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ছবি বা গল্প সাজান যে গুণানুসারে বা বর্ণনানুক্রমে হয় নাই, তাহা ব.. ..হুল্য।

রচনা সংগ্রহে, সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়—যে অকুণ্ঠিত সাহায্য করেছেন,—...কার দিনে তাহা একান্ত দুর্লভ, তাঁহার অপরিসীম স্নেহের ঋণের গুরুত্ব এতটা উপলব্ধি করিতেছি যে মাত্র দু'টী ছত্র কৃতজ্ঞতা স্বীকারে তাহা শোধ হইবে না জানি—সুতরাং সে চেষ্টা আমি করিব না।

চিত্রসংগ্রহ ব্যাপারে শিল্পীশ্রেষ্ঠ বন্ধুবর পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের অসীম সৌজন্য ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার কথা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না, তাঁহার স্নেহদৃষ্টিপাত ব্যতীত "নিরুপমা" বর্ষস্মৃতি এই অনুপম অঙ্গসৌষ্ঠব লাভ করিতে পারিত না। ভবিষ্যতে ইঁহাদের কাছে আরও ঋণ বৃদ্ধি করিবার আশা রাখি বলিয়া এ ঋণ শোধের কোন চেষ্টাই করিলাম না।

সমস্ত সাহিত্যসেবীই বাংলার এই পুরাতন ...বিক... গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একান্ত নিঃস্বার্থভাবে রচনা দান করিয়া আমাদের যে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা অচ্ছেদ্য। চিত্রশিল্পীগণও চিত্রাদি দানে যে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অন্যদেশে অন্য জাতির মধ্যে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস হয় না—এই চির-...দর, মুক্ত... আপনভোলা বাঙ্গালী শিল্পীদের কাছে ইহা যেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এক্ষণে যাঁহাদের জন্য এত কষ্টস্বীকার, এত অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও কত ক্ষতিস্বীকার করা গেল সেই সমস্ত গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের মনে যদি "বর্ষস্মৃতি" একটুও আনন্দ দিতে পারে তবেই সব সার্থক জ্ঞান করিব।

শারদীয়া ৬ই আশ্বিন ১৩৩২
৪৩, গ্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা

নিবেদক—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী



'চিন্তাকুলা' শিল্পী—

বিলাতী রোহিণী

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বিখ্যাত ফারম ঘোষ এণ্ড চাটার্জ্জি কোম্পানির প্রধান অংশীদার ও কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, চা স্নান কার্য্য সমাধা করিয়া, বেলা ৮টার সময় বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ, জ্বলন্ত কলিকাযুক্ত রূপার গুড়গুড়ি হস্তে খানসামাও নামিয়া আসিল। পূর্ব্ব হইতেই, কয়েকজন ভদ্রলোক, সাক্ষাতের অভিলাষে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছিলেন, বাবু প্রবেশ করিতেই তাঁহারা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া, বাবু একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া, আরামে গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে, ভদ্রলোকগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

মিনিট পনেরো কাল এইরূপ চলিলে, ডাকপিয়ন আসিয়া সেলাম করিয়া, বাবুর হস্তে কয়েকখানি পত্র ও প্যাকেট দিল। সেগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সত্যবাবু বলিলেন, "বিলাতী ডাক যে! এবার খুব সকালেই এসেছে ত!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া পিয়ন সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। বাবু তখন সেগুলি হইতে বাছিয়া, একখানি খুলিয়া, পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানি তাঁহার একমাত্র পুত্র, বিলাত-প্রবাসী শ্রীমান্ সুধাংশুভূষণ লিখিয়াছে।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে সত্যবাবুর মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্রোধ ও বিরক্তিতে ললাটদেশ সঙ্কুচিত ও নাসিকাগ্র স্ফীত হইতে লাগিল। পত্র পাঠ শেষ হইলে, সেখানি তিনি টেবিলের উপর আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, অন্যদিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন ভদ্রলোক সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনও খারাপ খবর নয় ত?"

সত্যবাবু সেকথার কোনও উত্তর না দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "বসুন, আমি একটু ভিতর থেকে আসি"—বলিয়া, চিঠিখানি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

আগন্তুক ভদ্রলোকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। একজন নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" অপর একজন উত্তর করিলেন, "কিছুই ত বোঝা গেল না!"

বাবু উপরে গিয়া, গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুধার চিঠি এসেছে।"

স্বামীর চোখমুখের ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেছে? ভাল আছে ত?"

"এই দেখ"—বলিয়া সত্যবাবু পত্রখানি স্ত্রীর হস্তে দিলেন। গৃহিণী পড়িতে লাগিলেন—

১৪৮নং কুইন্‌স্ রোড
লণ্ডন (W)
১২ই আগষ্ট……

শ্রীচরণেষু,

গত রবিবারে আপনার পত্র এবং টাকার ড্রাফ্‌ট পাইয়াছি। আপনারা সকলে কুশলে আছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

বাবা, গত কয়েক সপ্তাহ হইতে, লিখি লিখি করিয়া একটি কথা আপনাকে লিখিতে পারি নাই। কিন্তু সে কথা আর আপনাদের নিকট গোপন রাখা আমার উচিত হইবে না, তাই আজ লিখিতেছি।

বিগত গ্রীষ্মের বন্ধের সময়, আমি যখন ব্রাইটনে বায়ু-পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলাম, সেই সময় সমুদ্রস্নানকালে একটি যুবতীর জীবন বিপন্ন হয়। আমিও স্নান করিতেছিলাম, আমি অনেক কষ্টে সেই যুবতীর জীবনরক্ষা করি। সেই সূত্রে তাহার সহিত আমার পরিচয় হয়। আমি জানিতে পারি যে তাহার নাম ফ্লোরা ডাডলি, সে লণ্ডন ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করে, আমারই ন্যায়, গ্রীষ্মের বন্ধে সমুদ্রতীরে বায়ু-পরিবর্ত্তনে আসিয়া কোনও বোর্ডিংএ বাস করিতেছে। তাহার বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, শিশুকাল হইতেই বাপ মা নাই, নটিংহামশায়ারে তাহার এক পিতৃব্য থাকেন, এতদিন তিনিই উহাকে লালনপালন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল নয় বলিয়া, বৎসর খানেক হইতে ফ্লোরা লণ্ডনে আসিয়া চাকরি করিতেছে। ক্রমে তাহার সহিত আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল; প্রতিদিন সাক্ষাৎ হইত। লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াও সেইরূপ।

আমি প্রতিদিন বিকালে তাহার আপিসের ছুটির পূর্ব্বে, বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকি। সে আসিলে, দুইজনে একত্র বেড়াইতে যাই; কোন কোন দিন কোনও সাধারণ ভোজনাগারে সান্ধ্যভোজনও একত্র সমাধা করি।

বাবা, আপনি ত জ্ঞানী ব্যক্তি। আপনি ত জানেন এই প্রকার ঘনিষ্ঠতার পরিণতি কিরূপ দাঁড়ানো সম্ভব ও স্বাভাবিক। যাহা সম্ভব ও স্বাভাবিক, তাহাই হইয়াছে। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে না পাইলে, আমার জীবনটাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ফ্লোরার অবস্থাও তদ্রূপ। একদিন বিকালে কার্য্যবশতঃ আমি যথারীতি তাহার আপিসের নিকট গিয়া দাঁড়াইতে পারি নাই। সে অনেকক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া, আমার বাসায় আমাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল; বাসায় আমার কোনও সংবাদ না পাইয়া, বাসার সামনে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা কাল পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছিল; অবশেষে নিজ বাসায় ফিরিয়া গিয়া, বিছানায় শুইয়া পড়ে, সে রাত্রে সে কিছুই খায় নাই! পরদিন সন্ধ্যার পর হাইড্‌পার্কে এক নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া আকুল হইল!

বাবা, এই সব কথা লিখিলাম বলিয়া আমাকে আপনি নির্লজ্জ ও বাচাল মনে করিবেন না। এসব কথা আমার লিখিবার উদ্দেশ্য, আপনাদের একটা ধারণা দূর করা। যদিও একবার আপনি বিলাতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অধিক দিন ছিলেন না। ইংরাজললনা হইয়াও ফ্লোরা যারপর নাই কোমলহৃদয়া ও প্রেমময়ী। আপনাদের—শুধু আপনাদেরই বা বলি কেন, অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় নরনারীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, মেমেরা একান্ত পাষাণহৃদয়া হয়, এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্ম তাহাদের আদৌ অজ্ঞাত। ফ্লোরাকে আমি বিবাহ করিলে, আদর্শ হিন্দুপত্নীর মতই সে যে আমাকে ভক্তি ও সেবা করিবে, সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্কই যে সে অনুসরণ করিবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আপনাদের প্রতিও যে সে যথেষ্ট ভক্তিমতী হইবে তাহাও আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। আপনাদিগকে দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল। কথাবার্ত্তায় আপনাকে "পাপা" এবং মাকে "মাম্মা" বলিয়াই সে উল্লেখ করিয়া থাকে।

বাবা, অবস্থা সমস্তই খুলিয়া লিখিলাম। আমি জানি আপনি উদার, মহৎ, কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা বা কুসংস্কার আপনার নাই। তাই সাহস করিয়া সকল কথা আপনাকে লিখিয়া, এ বিবাহে আপনার ও মাতৃদেবীর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ আমি ভিক্ষা করিতেছি। পাঠ শেষ হইতে আমার এখনও দুই বৎসর বাকী আছে। ততদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নহে বলিয়া, আগামী ডিসেম্বর মাসে আমরা বিবাহ করা স্থির করিয়াছি। সে সময় আমার হাজার দুই টাকা আবশ্যক হইবে। বিবাহের পর আমার এলাউন্স বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে, কারণ তখন আর আপনার পুত্রবধূকে চাকরি করিতে দেওয়া শোভন হইবে না। আমরা যতদূর সম্ভব মিতব্যয়িতার সহিত গৃহস্থালী নির্ব্বাহ করিব। টাকাকড়ি সম্বন্ধে ফ্লোরা খুব শক্ত মেয়ে, একটি পয়সা তাহার হাতে অপব্যয় হইবার যো নাই।

এই পত্র অদ্য হইতে তিন সপ্তাহ পরে আপনার হস্তগত হইবে। ডাকে ইহার উত্তর আসিতে আরও তিন সপ্তাহ লাগিবে। অতদিন অপেক্ষা করিতে হইলে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। তাই মিনতি করিতেছি, মাতৃদেবীর সম্মতি লইয়া, মাত্র দুইটি কথায় আমায় একখানি টেলিগ্রাম করিয়া দিবেন। বিলাতে টেলিগ্রাম পাঠাইবার মাশুল অত্যন্ত অধিক, সুতরাং বিস্তারিতভাবে সকল কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই। আপনি যদি শুধু দুটি কথা "Bless you" (আশীর্ব্বাদ করি) টেলিগ্রাম করিয়া দেন, তবে আমি আপনার ও জননীদেবীর সম্মতি ও আশীর্ব্বাদ পাইলাম বলিয়া বুঝিব, এবং নিশ্চিন্ত হইব। আপনি আমার শতকোটি প্রণাম জানিবেন ও মাতৃদেবীকে জানাইবেন। আপাততঃ বিদায়।

আপনাদের চিরস্নেহের

সুধা।

গৃহিণী এই পত্রখানি যখন পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিয়দংশ পড়িবার পর, তাঁহার মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, তিনি নিকটস্থ একখানা চেয়ারে

বসিয়া পড়িলেন। পত্রপাঠ শেষ করিয়া, স্বামীর দিকে সাশ্রুনয়নে চাহিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হবে ?"

সত্যবাবু বলিলেন, "এ বিয়ে যেমন করে' হোক বন্ধ করতেই হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা তো বটেই! কিন্তু কি উপায়ে বন্ধ করবে? কেঁদে কেটে, ভয় দেখিয়ে, তুমি আমি দু'জনে যদি তাকে বারণ করে চিঠি লিখি তাহলে সে কি শুন্‌বে না ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "মাগীকে নিয়ে হারামজাদা যেরকম মসগুল হয়ে আছে, মানা করলেই যে শুন্‌বে এমন ত বোধ হয় না।"

"তবে ?"

"সেই কথাই ত ভাবছি। একটা কোনও উপায় করতেই হবে। মেম বিয়ে করে নিয়ে এলে, এদেশে যে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না! না দেশী সমাজে, না বিলাতী সমাজে, কোন সমাজেই যে সে মুখ পাবে না। পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের আশা পর্য্যন্ত লোপ হবে। দেখদেখি নচ্ছার বেটার আক্কেলখানা! উনি জানেন আমি উদার, মহৎ, আমার ভিতরে কোনও রকম কুসংস্কার নেই! আরে, মুর্গীই না হয় খাই, তাই বলেই কি হিঁদুয়ানি ছেড়ে দিয়েছি, আর তোকে মেম বিয়ে করতে অনুমতি দেবো? কি রত্নই পেটে ধরেছিলে গিন্নী!"

গিন্নী বলিলেন, "তুমি না হয় নিজেই একবার যাবে? গিয়ে ছেলেকে ধরে' নিয়ে আস্‌বে?"

সত্যভূষণ বাবু পূর্ব্বে যে বিলাত গিয়াছিলেন, তাহা সুধাংশুর পত্রেই প্রকাশ। কারবার সংস্পৃষ্ট ব্যাপারে তিন মাসের জন্য একবার তাঁহাকে বিলাতে যাইতে হইয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বার যাইতে কোনও আটক নাই।

সত্যবাবু বলিলেন, "মেরে ধরে তাকে নিয়ে আসবো? সে কি আর কচি খোকাটি আছে যে গালে একটা চড় কষিয়ে কাণ ধরে' হিড়হিড় করে টেনে আন্‌বো? রাস্কেল শুয়ার কোথাকার! সীতা সাবিত্রীর পদাঙ্কই সে অনুসরণ করিবে! খুঁজে খুঁজে কি সীতা সাবিত্রীই বের করেছে বেটা অকাল কুষ্মাণ্ড—বাঃ! শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। সে দেশে চাকরি করা মেয়েরা যে কেমন সীতা সাবিত্রী সে আর আমার জান্‌তে বাকী নেই!"

বিলাত প্রবাসকালে স্বামীর ব্রহ্মচর্য্য-পালন সম্বন্ধে গৃহিণী মাঝে মাঝে পরিহাস করিয়া থাকেন। অন্য সময় হইলে শেষের এই কথাটি লইয়া আজ তিনি স্বামীকে একটু পরিহাস না করিয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু ইহা পরিহাসের সময় নয়। তিনি ভীতভাবে বলিলেন, "সে কি গো? ছুঁড়ি কি তাহলে—গৃহস্থের মেয়ে নয়?"

কর্ত্তা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কক্ষনো নয়। ও খুড়ো জুড়ো সব ঝুট বাত। দেশে তার খুড়োখুড়ি থাকলে, ছুটির সময় সে সেইখানে গিয়ে কাটাতো—কাপ্তেন খুঁজতে ব্রাইটনে যেত না। তোমার ছেলেটিকে যেমন পেয়েছে গঙ্গারাম! শুনেছে মস্ত বড়লোকের একমাত্র ছেলে, গেঁথে ফেলেছে। বেটা, খাচ্ছিস খা, আবার ছাঁদা বেঁধে আনার দরকার কি বাপু? বামুনের ছেলে

কি না, ছাঁদা বাঁধা ভুলতে পারে নি! করুক না বিয়ে, করে' একবার মজাটি দেখুক। একটি পয়সা দেবো না, ত্যাজ্যপুত্র করবো। বিয়ের সময় খরচের জন্যে দুহাজার টাকা চাই! আব্দার দেখনা একবার! হতভাগা পাজি ছুঁচো হনুমান!"

আপিসের বেলা হইয়া যায়। স্নানাহার করিয়া সত্যবাবু আপিসে গেলেন। আহার—পাতের কাছে বসাই সার হইল। গৃহিণী ত সারাদিন শয্যা লইয়া রহিলেন।

২

আফিসে গিয়া, সত্যবাবু পুত্রের চিঠিখানি আর একবার পাঠ করিলেন। ছেলে লিখিয়াছে, দুইটিমাত্র কথা তার করিয়া দিবেন—"Bless you"। সত্যবাবু, একখানি বিলাতী টেলিগ্রামের ফরম লইয়া, রাগের মাথায় তৎপরিবর্ত্তে লিখিলেন "Damn you" (উচ্ছন্ন যাও)। ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, চাপরাশি আসিয়া দাঁড়াইল। টেলিগ্রামখানা তাহার হাতে দিবার জন্য উঠাইলেন;—আবার নামাইয়া রাখিলেন। ভাবিলেন, এরূপ টেলিগ্রাম পাইয়া, ক্রোধে ও নৈরাশ্যে ছেলে যদি বিবাহই করিয়া বসে! তা ছাড়া, টেলিগ্রামখানা এই দীর্ঘযাত্রাপথে যে সকল কর্ম্মচারী ও কর্ম্মচারিণীর হাতে পড়িবে, তাহারাই বা ভাবিবে কি! একজনকে মাত্র গালি দিবার জন্য, ৫০।৬০ টাকা যে ব্যয় করিয়াছে, তাহাকে লোকে উন্মাদ ভিন্ন আর কি মনে করিবে? তাই তিনি সেখানা ছিঁড়িয়া, অন্য একখানা টেলিগ্রাম লিখিলেন, তাহাতে শুধু একটি মাত্র শব্দ রহিল—"Wait" (সবুর)।

সন্ধ্যার পর সত্যবাবুর মোটর, বালিগঞ্জে এক বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার মিষ্টার সেনের গৃহের ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। ইনি সত্যবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। সেন সাহেব তখন রাত্রিবসন পরিধান করিয়া, লাইব্রেরী গৃহে একখানা আরাম কেদারায় পড়িয়া, চশমা চোখে দিয়া বই পড়িতেছিলেন। তাঁহার মুখে পাইপ, পার্শ্বস্থ টেবিলে হুইস্কির গ্লাস। বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, "হঠাৎ যে! খবর কি হে?"

সত্যবাবু পকেট হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া সেন সাহেবের হাতে দিলেন। সেন তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "এ যে জবর খবর! তা, টেলিগ্রাম করে দিয়েছ ত?"

কি টেলিগ্রাম করিতে যাইতেছিলেন, সেখানা ছিঁড়িয়া কি টেলিগ্রাম করিয়াছেন, দুই রকমই সত্যবাবু বলিলেন। শেষে বলিলেন, "উপায় কি করা যায় বল দেখি? আমি ত নিজে যাওয়া একরকম স্থিরই করেছি। সেখানে গিয়ে কিরকম কার্য্যপ্রণালীটা অবলম্বন করি বল দেখি?"

"নিজে যাচ্ছ? তাহলে আর ভাবনাটা কি? কিছু টাকা খরচ করলেই হল।"

"কি করবো? ছুঁড়িকে কিছু টাকা দিয়ে, তাকে ভাগিয়ে দেবো?"

সেন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়া বলিলেন, "উঁহু! সে সুবিধে হবে না। ছুঁড়ী কি রাজি হবে? সে হয়ত ভাববে, বিয়ে হলে এই বুড়োর ষোল আনা সম্পত্তিই ত আমার; এখন দু', কি পাঁচহাজার

নিয়ে কি হবে? কিংবা, সে টাকাও নিতে পারে, বিয়ে করবার মৎলবও পরিত্যাগ না করতে পারে। তার চেয়ে বরঞ্চ এক কায কর না, সত্য!"

সত্যবাবু সাগ্রহে বলিলেন, "কি?"

"দাঁড়াও"—বলিয়া তিনি গ্লাস তুলিয়া সেটা খালি করিয়া বলিলেন, "তোমাকেও একটা পেগ দিক?"

সত্যবাবু সম্মতি জানাইলে, বয়কে ডাকিয়া দুইটা পেগ দিতে আদেশ করিলেন। পাইপ টানিতে টানিতে বলিলেন, "কৃষ্ণকান্তের উইল পড়েছ ত? গোবিন্দলালের ঘাড় থেকে ভূত ছাড়াবার জন্যে ভ্রমরের বাপ মাধবীনাথ যে ফন্দি করেছিলেন, তুমিও তাই কর না কেন?"

সত্যবাবু বলিলেন, "নিশাকর পাই কোথা?"

"নিশাকর হবার মত একটি লোক আমার হাতে আছে।"

"কে?"

"নবীন দত্ত। হীরুদত্তের ছেলে নবীন দত্ত। বছর ৫।৭ হতভাগাটা বিলেতে ছিল; শুধু স্ফূর্ত্তি করেই বেড়িয়েছে—পাস টাস কিছু করতে পারেনি। বিলাতে যে কত লীলা সে করে' এসেছে তার সংখ্যা নেই। একবার না দু'বার তার জেল পর্য্যন্ত হয়েছিল। বাপ মারা যাবার পর টাকার অভাবে দেশে ফিরে এসেছে—এখন বেকার অবস্থায় চাকরির চেষ্টায় ঘুরছে। সে যেরকম বদমাইস, কিছু থোক্ টাকা পেলে স্বচ্ছন্দে রাজি হবে এখন। কায হাঁসিল করে আস্‌বে।"

সত্যবাবু বলিলেন, "টাকা খরচ করতে আমি রাজি আছি।"

"তাকে মেহনতানা দিতে হবে। তার পর, সরঞ্জামি খরচ। সে একটা রাজাটাজা, নবাবটবাব সেজে, ছুঁড়িকে হাত করে নেবে কিনা! সুতরাং তাকে একটু লম্বা হাতেই টাকা খরচ করতে হবে।"

সত্যবাবু বলিলেন, "বুঝেছি। টাকার জন্যে আটকাবে না। সে লোক কোথায়, তাকে একবার ডাকাও না।"

সেন বলিলেন, "সে কি এখন আস্‌বে? সে এখন ক্লাবে বসে মদ টানছে। কাল সন্ধ্যাবেলা বরঞ্চ তাকে এখানে আনিয়ে রাখ্‌বো। তুমি সন্ধ্যার পর এস। তার বায়না স্বরূপ কিছু টাকাও সঙ্গে এন।"

"বেশ, তাই আনবো।"

দুই চারিটি অন্যান্য কথার পর সত্যবাবু উঠিলেন।

পরদিন সত্যবাবু যথা সময়ে বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়া, দত্ত সাহেবের দেখা পাইলেন। দত্ত রাজি। ইংরাজিতে বলিল, "এ আর একটা শক্ত কথা কি? সে ঠিক হয়ে যাবে এখন। আমাকে কিন্তু নবাব সাজতে হবে। নবাবোচিত সকল সরঞ্জামই চাই। অন্য সব জিনিষ সেখানেই পাওয়া যাবে, কেবল একটা জম্‌কালো রকমের রূপোর গুড়গুড়ি, লক্ষ্ণৌয়ের খানিকটে সুগন্ধি তামাক, আর কিছু টিকে, এখান থেকে সঙ্গে নিতে হবে। আর, একটা ফেজ ক্যাপ।"

তিন জনে বসিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। ইত্যবসরে দত্ত আধ বোতলের উপর উদরস্থ করিয়া ফেলিল। সত্যবাবুর নিকট টাকা লইয়া সে যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, তাহার পা একটুখানি টলিলও না।

৩

দত্তসাহেবকে সঙ্গে লইয়া, পি-এণ্ড-ও কোম্পানির মল্‌ভেভিয়া নামক মেল ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া, যথাসময়ে সত্যবাবু লণ্ডনে আসিয়া পৌছিলেন। ঐ মেলেই, সত্যবাবুর লিখিত একখানি পত্রও সুধাংশুর নামে আসিয়া পৌছিল, তাহাতে "হাঁ, না" কিছুই নাই, আছে শুধু তাহার প্রণয়িনী সম্বন্ধে গুটিকতক ফাঁকা প্রশ্ন,—কেমন বংশ, খুড়া কিরূপ লোক ইত্যাদি। সময় লইবার ফিকির—আর কিছুই নয়।

ট্রেণ হইতে নামিয়া উভয়ে একটা হোটেলে গিয়া উঠিলেন। পরদিন প্রাতে, দত্ত বাসা খুঁজিতে বাহির হইল এবং একটু দূর অঞ্চলে, বাসা ঠিক করিয়া, সত্যবাবুকে সেখানে লইয়া গেল। সত্যবাবু যে লণ্ডনে আসিয়াছেন, এখন সুধাংশুকে তাহা জানিতে দেওয়া অভিপ্রেত নহে।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, দত্ত বাহির হইয়া, লণ্ডন ব্যাঙ্কে গিয়া উপস্থিত হইল। কত পুরুষ, এবং কত স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী, ভিতরে বসিয়া কায করিতেছে—গরাদের ভিতর দিয়া তাহাদের সকলকেই দেখা যায়। ১৯৷২০ বৎসর বয়সের মেয়ে অনেকগুলিই রহিয়াছে, কোন্‌টি যে ফ্লোরা, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। দত্ত তখন ব্যাঙ্কের একজন ছোকরাকে ডাকিয়া, তাহার হস্তে একটি শিলিং গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "ওহে ছোকরা, একটু এদিকে এস ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

অর্থলাভে খুসী হইয়া দন্ত বাহির করিয়া, বালক দত্তসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে একটা নিভৃত স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। দত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যাঙ্কে মিস্ ডাড্‌লি নামে যে একটি যুবতী চাকরি করে, তাহাকে তুমি চেন?"

বালক বলিল, "ফ্লোরা ডাড্‌লি ত? খুব চিনি। ডাকিয়া দিব?"

"হাঁ—দাও ত।"

বালক ছুটিয়া চলিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, যে সকল যুবতী বসিয়া টাইপ-রাইটিং-এর কার্য্য করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের কাণে কাণে কি বলিল। বলিতেই, সেই যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের ভিড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দত্ত ভিড়ের আড়ালে লুকাইয়া সেই যুবতীকে দেখিতে লাগিল। যুবতী, বালকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে দেখিয়া, তখন দত্ত সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। বাস্তবিক, ফ্লোরার সঙ্গে দেখা করা তাহার উদ্দেশ্য নহে; দেখা হইলে, সে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, কেন মহাশয়? তখন কি উত্তর দিবে? উদ্দেশ্য—তাহাকে চেনা, এবং ব্যাঙ্কে সে কি কার্য্য করে তাহা জানা। উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছে।

দত্ত, সেখান হইতে সোজা ফ্লীট ষ্ট্রীটে গেল। সেখানে অনেক সংবাদপত্রের আপিস। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে, উপর্যুপরি তিন দিন প্রভাতে প্রকাশ জন্য নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি দিল :—

WANTED

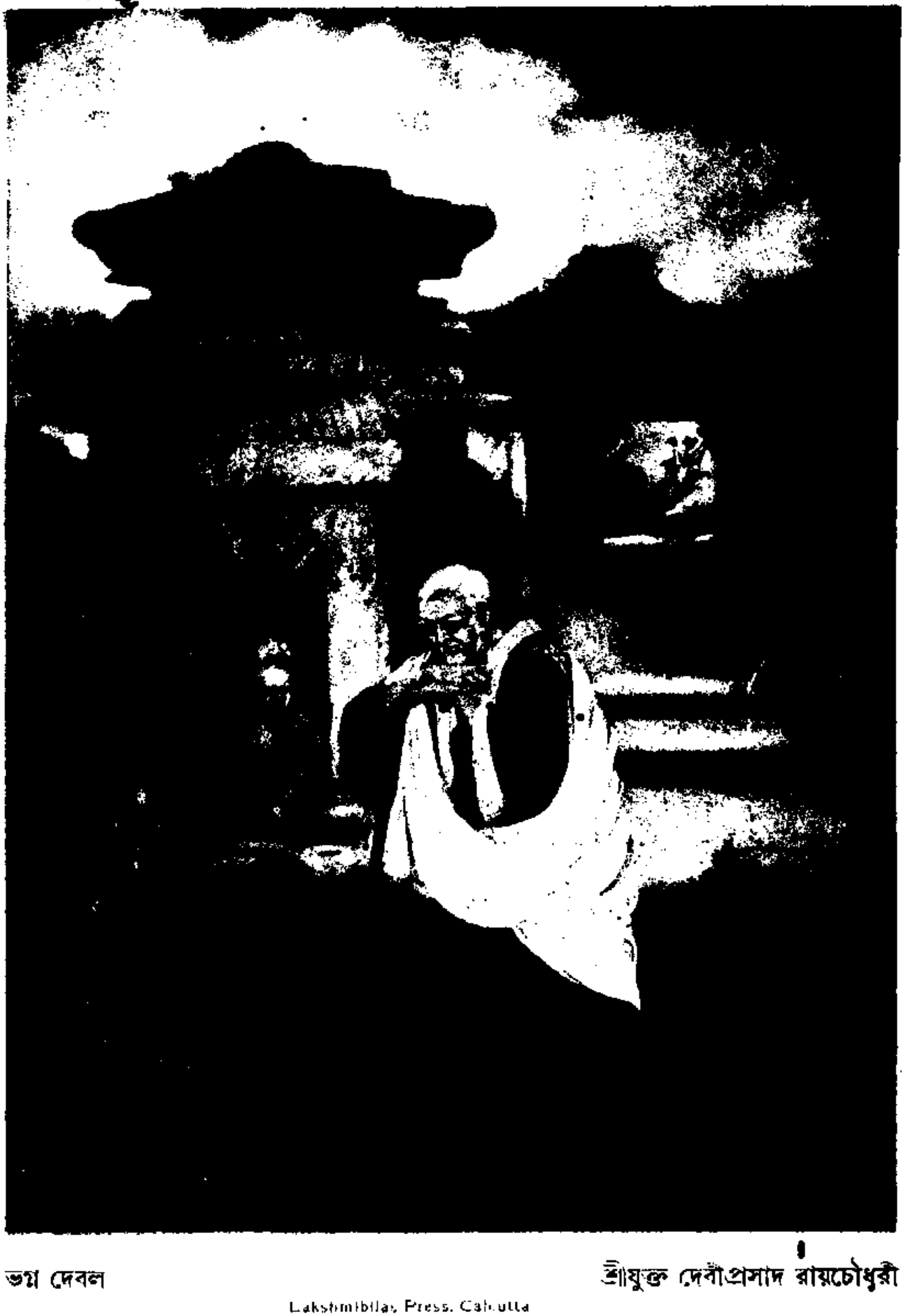
অবসর সময়ে টাইপ-রাইটিং কার্য্যের জন্য একটি যুবতীর প্রয়োজন। সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা, দুই ঘণ্টা কার্য্য করিতে হইবে। বেতন সপ্তাহে ৪ গিনি। বয়স ও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ সহ আবেদন করুন।

বক্স নং······C/o ম্যানেজার·········

বিজ্ঞাপন দিয়া, পাঁচটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে দত্ত আবার ব্যাঙ্কের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল একজন ভারতবর্ষীয় যুবক, একস্থানে দাঁড়াইয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছে। পাঁচটার পরেই ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণসহ ফ্লোরাও বাহির হইয়া আসিল। যুবক তাহাকে দেখিবামাত্র টুপী উত্তোলন করিল; উভয়ের করমর্দ্দন হইল; অল্পদূরে দাঁড়াইয়া দত্ত শুনিল, ফ্লোরা বলিতেছে, "সুডা, আজ বেলা ৩টার সময় তুমি কি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলে?" সুধা বলিল, "কৈ না!" ফ্লোরা বলিল, "আজ বেলা ৩টার সময় ব্যাঙ্কের একজন ছোকরা আসিয়া বলিল, "কোনও কৃষ্ণবর্ণ ভদ্রলোক তোমায় ডাকিতেছেন।" ভাবিলাম, নিশ্চয় তুমিই কোনও দরকারে আসিয়াছ। বাহিরে আসিয়া তোমায় কোথাও দেখিতে পাইলাম না। ছোকরাটাও চারিদিকে ছুটাছুটি খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, "কৈ তাঁকে ত দেখিতেছি না।" সুধা বলিল, "আর কেহ বোধ হয়, আর কাহাকেও খুঁজিতেছিল।"—"তাই হবে"—বলিয়া দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল এবং শীঘ্রই ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া গেল। দত্ত মনে মনে হাসিয়া, অম্‌নিবাসে উঠিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিল।

দুইদিন পরে, চারিখানি সংবাদ পত্রের আপিস হইতে চারি বোঝা আবেদন পত্র আসিয়া পৌঁছিল। দত্ত সেগুলি গণিয়া দেখিল, দুই হাজারেরও উপর। সত্যবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এত?" দত্ত বলিল, "হবে না? সারাদিন আপিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে সপ্তাহে দেড় গিনি দু'গিনির বেশী পায় না; এটা, অবসর সময়ে ঘণ্টা দুই কাষ করেই চার গিনি! তা ছাড়া, নিয়োগকর্ত্তা ধনী ও অবিবাহিত হলে, অনেক সময় টাইপ রাইটিং ছুঁড়ির সঙ্গে বিয়েও হয়ে যায়।—সেও একটা ফিউচর্ প্রস্পেক্ট (ভবিষ্যৎ আশা) আছে ত!"

উভয়ে তখন পত্রগুলি ভাগাভাগি করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আবেদনকারিণীর নামটি মাত্র দেখিয়াই, সেখানা ছিঁড়িয়া ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টাকাল বৃথা পরিশ্রমের পর, দত্ত লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "এই দেখ।—লণ্ডন ব্যাঙ্কের ফ্লোরা ভাড্‌লি।—বয়স ১৯ বৎসর। মার দিয়া কেল্লা!"



ভগ্ন দেবল

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

Lakshmibilas Press, Calcutta

সত্যবাবু পত্রখানি লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। বলিলেন, "সেই হারামজাদীই বটে। বেটা মূর্খ—দেখ, এইটুকু চিঠির মধ্যে তিনটে বানান ভুল!"

দত্ত বলিল, "মূর্খ না ত কি! সে যাক্। তোমার ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করেই অবশ্য এ দরখাস্ত করেছে। সন্ধ্যা বেলাটাই ওদের লীলা খেলার সময় কি না; তোমার ছেলে যে মত দিলে বড় ?"

সত্যবাবু বলিলেন, "বোধহয় ভেবেছে, বাবার চিঠিতে তেমন উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত ফেরবার আগে ভিন্ন বিবাহই হবে না। ... দু'ঘণ্টা বৈ ত ৬টা থেকে ৮টা। ইতিমধ্যে ফাঁকতালে যা রোজগার হয়ে যায়।"

দত্ত বলিল, "তাই বোধ হয় ওদের পরামর্শ।"

৪

সত্যবাবুকে পূর্ব্ব বাসায় রাখিয়া, দত্ত সাহেব কেনসিংটন গার্ডেন্সে আসিয়া উচ্চ মূল্যে নূতন বাসা স্থির করিয়াছে। ঘরগুলি পূর্ব্ব হইতেই বহুমূল্য আসবাব পত্রে সজ্জিত ছিল, নবাবোচিত কতকগুলি জিনিষও সংগৃহীত হইয়াছে। আহারাদির বন্দোবস্তও ধনীজনোচিত। এখানে আসিয়া দত্ত নিজের নাম বলিয়াছে—'নবাব অব্ পান্নাগড়।' একজন পুরুষ ভৃত্য (valet) নিযুক্ত করিয়াছে; এবং মাসিক ভাড়ায় একখানা দামী রোলস্ রয়েস মোটর গাড়ীও নিযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ধ্যার পর এই জাল নবাবটী, নকল পান্নার গোটাকতক আংটি আঙুলে পরিয়া, রূপার গুড়গুড়িতে, সোণার ঝালরযুক্ত সরপোষে ঢাকা কলিকায়, সুগন্ধি অম্বুরী তামাকু সেবন করিতেছে। পার্শ্বস্থ টেবিলে হুইস্কির গেলাস। মাঝে মাঝে তাহাও পান করিতেছে। ঘড়িতে ঠংঠং করিয়া ছয়টা বাজিল। দাসী আসিয়া বলিল, "মিস্ ডাড্লি।"

"নিয়ে এস।"—বলিয়া দত্ত গম্ভীরভাবে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিল।

অর্দ্ধমিনিট পরে, ফ্লোরা আসিয়া প্রবেশ করিল। দত্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভিবাদন ও করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে বসাইল। সে কতদিন লণ্ডনে আছে, কোথায় তাহার বাসা, আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে, বিনীত ও মধুরভাবে এই রকম কতকগুলি প্রশ্ন তাহাকে করিতে লাগিল। তারপর নিজ পরিচয় এইরূপ দিল—

"আমার পিতা, লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বাল্যকালেই আমাকে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি ইংলণ্ডেই ছিলাম। পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দেশে চলিয়া যাই। আমিই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। গদি পাইয়া, আমি রাজ্যশাসন করিতে লাগিলাম। রাজ্যটি ছোট। আয় তেমন বেশী নয়। বার্ষিক আয় মাত্র চৌদ্দ লক্ষ টাকা—অর্থাৎ তোমাদের লক্ষ পাউণ্ডের কাছাকাছি। একদিন আমি মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছি, একটা গ্রামের মাতব্বর প্রজা আসিয়া এক টুকরা সবুজ পাথর আমার হাতে দিল। বলিল নিজ ক্ষেত চষিতে চষিতে

"কি রকম? এত শীঘ্র হবে মনে কর?"

"হবে। শোননা বলি। কাল আমার বাসায়, দু'জনে শ্যাম্পেন ডিনার খেয়ে, সোফায় হেলান দিয়ে বসে গল্প করছি আর ব্রাণ্ডি টানছি, কথায় কথায় ছুঁড়ি বল্লে—'নোবি।'—নবাবকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে, সে আমার আদরের নাম রেখেছে 'নোবি' কিনা!—বল্লে 'নোবি! আমার ইচ্ছা করে, তোমাতে আমাতে দুজনে একদিন থিয়েটারে যাই।'—বল্লাম, বেশ ত! চলনা, যেদিন ব'লবে। অ্যাপলো থিয়েটারে "থ্রী লিট্‌ল মেড্‌স্" হচ্চে—ভারি মজার ব্যাপার, কালই চল,—বল এখনই টেলিফোনে বক্স রিজার্ভ করে রাখি!"—ছুঁড়ি বল্লে, 'কাল কি করে যাওয়া হতে পারে?—কি পরে আমি যাব? তোমার সঙ্গে রোল্‌স রয়েস্ কার থেকে থিয়েটারে নাম্‌বো কি এই ঝিয়ের পোষাক পোরে? আমি বল্লাম, "ও:—সেইজন্যে? তা চলনা, কালই তিন দিনের কড়ারে বণ্ডষ্ট্রীতে তোমার পোষাক ফরমাস দেওয়া যাক। শনিবার দিন সেই পোষাকে তুমি আমার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে পারবে।"—তাই ভাই কাল পোষাকটি ফরমাস দিতে হবে টাকা দাও।"

সত্যবাবু বলিলেন, "তা দিচ্ছি, কিন্তু, একহপ্তা পরে, ছেলে নিয়ে বাড়ী যাব তুমি কি বলছ?"

দত্ত বলিল, "শোন তবে, আমার প্ল্যান বলি। এবার তোমায় আত্মপ্রকাশ করতে হবে। ছেলের সঙ্গে গিয়ে কাল দেখা কর, যেন আজই এসে পৌঁছেছ। শনিবারে আমি যে থিয়েটারে যাব, তুমিও ছেলেকে নিয়ে সেই রাত্রে ঐ থিয়েটরে যেও। দিনের বেলা ছেলেকে বোলো, চলনা থিয়েটর দেখে আসা যাক! বলে', একখানা খবরের কাগজ তুলে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দেখে, অ্যাপলো থিয়েটারের নাম করে দেবে।"

সত্যবাবু বলিলেন, "ও: বুঝেছি তোমার মৎলব। যাতে সুধা তোমাদের দুজনকে একত্র দেখ্‌তে পায়।"

"ঠিক তাই। আমরা দুজনেই বেশ গোলাপী চোখে বক্সে বসে' থাকবো, আর, এদেশে যাকে lovey dovey বলে, সেইরকম, জোটের পায়রা দুটির মত আচরণ করবো।"

সত্যবাবু বলিলেন, "কিন্তু—কিন্তু ছেলে বেটা যদি তাই দেখে উন্মত্ত হয়ে ওঠে—একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে?"

দত্ত বলিল, "যদি ছুটে গিয়ে, গলায় হাত দিয়ে গর্জ্জন করে ওঠে—'রোহিণি!—আমি তোমার যম!'—এই ভয় করছ তুমি?"

"হ্যাঁ, ঐ রকম।"

দত্ত, সত্যবাবুর বাহুতে করাঘাত করিয়া বলিল, "কোনও চিন্তা নেই দাদা! এ প্রসাদপুরের মাঠ নয়—এখানে গোবিন্দলালের অভিনয় করবার চেষ্টা করলেই, লণ্ডন-পুলিস অমনি মজাটি দেখিয়ে দেবে বাছাধনকে!"

প্রচুর পরিমাণ হুইস্কি টানিয়া, টাকা লইয়া দত্ত প্রস্থান করিল।


A Study

৬

শুক্রবার সন্ধ্যায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় হাইডপার্কে ফ্লোরার সঙ্গে দেখা হইলে সুধা বলিল, "ফ্লোরা, মস্ত খবর। গতকল্য বাবা হঠাৎ লণ্ডনে পৌছিয়াছেন; আজ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। বলিলেন, 'সে মেয়েটিকে একবার নিজের চক্ষে না দেখিয়া, কি করিয়া তোমাদের বিবাহ অনুমোদন করি বল; তাই চলিয়া আসিলাম।'—কাল্ কখন তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করিবে বল দেখি ?"

ফ্লোরা বলিল, "তাইত প্রিয়তম,—বড় মুস্কিল হইল যে! নটিংহাম হইতে চিঠি আসিয়াছে, আমার খুড়া অত্যন্ত পীড়িত। তাই কাল শনিবার আপিসের পর ২টার গাড়ীতে আমি নটিংহাম যাইব স্থির করিয়াছি। খুড়াকে দুই দিন একটু সেবাশুশ্রূষা করিয়া আসি, উইলে আমায় কিছু দিয়াও যাইতে পারেন।"

"কবে ফিরিবে ?"

"সোমবার প্রাতে আসিয়া আবার আপিস করিব। শনি রবি এই দুইটি দিন কেবল তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ।"

"আচ্ছা, যদি না গেলেই নয়, তবে যাইও। সোমবারে এইখানে আবার দেখা হইবে ত ?"

"হ্যাঁ, তা হইবে বৈকি। 'পাপা'র সঙ্গে দেখা করা সম্বন্ধে, সোমবারেই তোমাতে আমাতে পরামর্শ হইবে।"

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিল। পার্কের বাহির হইয়া, যে পাড়ায় ফ্লোরা থাকে, সেই দিকের অমনিবাসে তাহাকে উঠাইয়া দিয়া, সুধা অন্য গাড়ীতে আরোহণ করিল। ফ্লোরা কিন্তু কিয়দ্দূর মাত্র গিয়া, সে গাড়ী হইতে নামিয়া, ট্যাক্সি লইয়া সোজা নবাব সাহেবের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। তার পর, নবাব সাহেবের পোষাক কামরায় গিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, সান্ধ্যবেশ ও নবাব্জিত নকল হীরা মুক্তার অলঙ্কারগুলি পরিয়া, নবাবসাহেবের সহিত ভোজনে বসিল। ইদানীং প্রায় প্রতিরাত্রেই সে, 'বড় ক্ষুধা পাইয়াছে' 'বড় ঘুম পাইতেছে' ইত্যাদি অছিলায় হাইড্পার্কে সুধার নিকট তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করিয়া, নিজ বাসায় ফিরিবার নাম করিয়া এইখানেই আসিয়া রাজভোগে পানাহার করে, এবং কথাবার্ত্তায় অধিক রাত্রি হইয়া গেলে, সবদিন বাসায় ফিরিয়া যাওয়াও ঘটে না!

শনিবারদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সত্যবাবু পুত্রের নিকট থিয়েটারে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। সুধা ভাবিতেছিল, ফ্লোরা সহরে নাই, কেমন করিয়া আজ সন্ধ্যা কাটিবে! পিতার এ প্রস্তাবে সে যেন বাঁচিয়া গেল।

যথাকালে সত্যবাবু, পুত্রসহ অ্যাপলো থিয়েটরে উপস্থিত হইলেন। অর্দ্ধগিনি মূল্যের এক একখানি টিকিট ও ছয় পেনি মূল্যের একখানি প্রোগ্রাম কিনিয়া, ষ্টলে গিয়া তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলেন। ১৫।২০ মিনিট পরে অভিনয় আরম্ভ জন্য আলোক নির্ব্বাপিত হইল। প্রায়

সেই সময়েই, দ্বিতলের বামদিকের বক্সখানিতে, কাহারা প্রবেশ করিল, সুধাংশু ভাল দেখিতে পাইল না।

প্রথম অঙ্ক শেষ হইলে, সুধাংশু সেই বক্সের পানে চাহিয়া দেখিল, মহার্ঘ্য বসনভূষণে সজ্জিতা কোনও সুন্দরী, একজন ভারতীয় যুবাপুরুষের পার্শ্বে বসিয়া হাস্যপরিহাস করিতেছে। এই যুবককে সে পান্নাগড়ের নবাব বলিয়া চিনিতে পারিল, পূর্ব্বে ২।১ বার দূর হইতে ইহাকে দেখিয়াছিল। প্রথমটা সুধাংশুর চক্ষে ধাঁদা লাগিয়া গিয়াছিল, ফ্লোরাকে সে চিনিতে পারে নাই। তারপর বেশ বুঝিতে পারিল, ঐ তরুণী ত আর কেহ নয়, তাহারই সাধের প্রণয়িণী!

দেখিয়া, সুধার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বলিল, "বাবা, বড্ড গরম, আমি একটু বাইরে থেকে আসি।"—বলিয়া থিয়েটরের বার্-এ গিয়া, একগ্লাস ব্রাণ্ডি লইয়া, চোঁ চোঁ করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

ফিরিয়া আসিয়া সে আবার পিতার পার্শ্বে বসিল। কিন্তু অভিনয়ের এক অক্ষরও আর তাহার কাণে গেল না। আলো জ্বলিলেই, সেই বক্সের পানে আবার চাহিয়া রহিল। দুইজনে হাসি গল্পের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সোহাগে এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। রীতিমত "লভি ডভি" অবস্থা! সুধাংশু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। সত্যবাবু বলিলেন, "তোমার কি শরীর ভাল নেই, অসুখ করছে? বাড়ী যাবে?"

সুধাংশু ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

রাত্রি ক্রমে ১১টা বাজিল, অভিনয় শেষ হইল। অন্যান্য দর্শকগণের সঙ্গে ইহারাও পিতাপুত্রে বাহির হইল। ভেষ্টিবুলে আসিয়া সুধা বলিল, "বাবা, এইখানে একটু দাঁড়ান আমি শীগ্‌গির আসছি।"—বলিয়া সে রাস্তার ধারে নামিল।

ঐ অদূরে পেভ্‌মেণ্টের উপর, কারের অপেক্ষায় নবাব সাহেবের বাহু অবলম্বনে ফ্লোরা দাঁড়াইয়া। সুধা হন হন করিয়া তথায় গিয়া, উত্তেজিত ও শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "ফ্লোরা, নটিংহাম যে লণ্ডনের এত কাছে তাহা জানিতাম না। কখন ফিরিলে? খুড়াটি কেমন আছে বল দেখি!"

ফ্লোরা মহাবিপদে পড়িল। পান্নাগড়ের রাণী হইবার আশাও সে মনে পোষণ করে; কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলা যায় না বলিয়া, সুধাংশুকেও সে হাতছাড়া করে নাই। এখন একূল ওকূল দুই কূল যাইবার দাখিল! সুতরাং সে নবাব-কূল বজায় রাখিবার আশায়, মস্তক উত্তোলন করিয়া উদ্ধত স্বরে বলিল, "Sir! I don't know you." (মহাশয়, আমি আপনাকে চিনি না)।

সুধা তাহাকে ভেঙাইয়া ব্যঙ্গস্বরে, বলিল, "বটে! কবে থেকে, প্রেয়সী?"

নবাব সাহেব বলিয়া উঠিলেন "How dare you insult the future Ranee of Pannagarh!"—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ণমূলে ধাঁ করিয়া এক ঘুষি!

ঘুষি খাইয়া সুধা ঠিকরাইয়া কয়েক হাত হটিয়া গেল। আঘাতের স্থানে হাত দিয়া, পুলিস পুলিস বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

পথচারী দুই চারিজন লোক, গোড়া হইতে এই ব্যাপার দেখিতেছিল। প্রকাশ্যভাবে একজন মহিলার এই অপমানে তাহারা আগুন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বলিল, "Serve you right, young man!" (তোমার উপযুক্ত প্রতিফলই পাইয়াছ, ছোকরা!) গোলমাল শুনিয়া, একজন পুলিশ কনষ্টেবলও ছুটিয়া আসিল। লোকের নিকট ব্যাপার অবগত হইয়া, সুধার স্কন্ধে তাহার সেই স্থূল হস্ত অর্পণ করিয়া বলিল, "Off with you, drunken nigger! Think twice, before you insult an English lady again."—(হট যাও মাতাল কালা আদমি! ভবিষ্যতে একজন ইংরাজ রমণীকে অপমান করিবার আগে, বেশ করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিও।)—বলিয়া সুধাংশুকে এক ধাক্কা দিল।

সত্যবাবু নিকটেই ছিলেন। পুত্রকে লইয়া, তাড়াতাড়ি ক্যাবে তুলিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

পথে যাইতে যাইতে, ফ্লোরার বিশ্বাসঘাতকতার কথা পিতাকে বলিতে বলিতে, সুধা ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। একে কোমলপ্রাণ বাঙ্গালী সন্তান, তার উপর মদ খাইয়াছে!

সত্যবাবু পুত্রকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

ওদিকে রোলস্ রয়েস্ কারে বসিয়া "নবাব" নৈকট্য সান্নিধ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে, ফ্লোরা?"

ফ্লোরা বলিল, "কে জানে কে! একদিন আমাদের ব্যাঙ্কে একখানা চেক ভাঙ্গাইতে গিয়াছিল, সেই সময় আমি উহাকে একটু সাহায্য করি। সেই অবধি ও আমার পিছু লইয়াছে, নানাভাবে আমায় জ্বালাতন করে।"

নবাব বলিল, "এবার বোধহয় উহার শিক্ষা হইবে।"

"হওয়া ত উচিত।"—বলিয়া ফ্লোরা নীরব হইল।

পরদিন রবিবার। সত্যবাবু বলিলেন, "বাবা, তুমি মনে বড় আঘাত পেয়েছ। আমি বলি কি, আমার সঙ্গে দেশে চল। সেখানে কিছুদিন থাকলে, তোমার মনটা আবার সুস্থ হবে।"

সুধাংশু সহজেই সম্মত হইল। সোমবার প্রাতে পিতাপুত্রে টমাস কুকের বাড়ী গিয়া জানিলেন, অন্তরাত্রে লণ্ডন হইতে ট্রেণে ছাড়িলে, মার্সেলস্ বন্দরে ভারতগামী একখানি ফরাসী জাহাজ ধরা যাইবে। সত্যবাবু দুইখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া আনিলেন।

অবসর মত সত্যবাবু দত্তসাহেবের সহিতও দেখা করিয়াছিলেন। তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন; টাকাকড়িও বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, "আহা, ছেলেটাকে অমন ক'রে ঘুষি মারা তোমার ভাল হয়নি কিন্তু।"

দত্ত বলিলেন, "দাদা, যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল নইলে চলবে কেন? ঐ মুষ্টিযোগটুকু না হলে কি আর বাবাজী অমন লক্ষ্মীটি হয়ে তোমার সঙ্গে বাড়ী যেতে রাজি হতেন? ভাল পরামর্শই হয়েছে—আজ রাত্রেই সরে পড়। দেশে গিয়েই, একটি বেশ সুন্দরী ডাগর মেয়ে দেখে বাবাজীর বিয়ে দিয়ে ফেলো। আর তাকে বিলেত মুখোও হ'তে দিও না।"

সত্যবাবু বলিলেন, "আবার নেড়া বেলতলায় যায়! এখন, তুমি কি করবে বল? কবে দেশে ফিরবে?"

"হপ্তা খানেক পরেই। আসছে মেলে, আমিও আমার হবু রাণীটিকে কদলী প্রদর্শন ক'রে,—চম্পট পরিপাটি দেবো আর কি!"

"হ্যাঁ, বেশী দেরী কোরো না।"—বলিয়া সত্যবাবু উপকারী বন্ধুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চিরকুণী *

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার পিতা বাঙ্গালা হইতে যখন কটকে বদলী হইয়া সেখানে সপরিবারে গমন করিলেন, তখন আমার বয়স একবৎসর মাত্র। সুতরাং আমাদের কটকে যাইবার কথা আমার কিছুমাত্র মনে নাই। আমি বাবার মুখে মায়ের মুখে আমাদের কটকে যাইবার পথ-ক্লেশের বর্ণনা শুনিতাম, আর মনে করিতাম বুঝি কোনও নক্ষত্রলোক বা চন্দ্রলোক হইতে আমরা এই পৃথিবীতে অর্থাৎ কটকে আসিয়াছি। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কলিকাতা হইতে কটকে যাইতে হইলে গরুর গাড়ী করিয়া মেদিনীপুর ও বালেশ্বরের ভিতর দিয়া যাইতে হইত। তখন রেলগাড়ী বা ষ্টীমার কলিকাতা হইতে কটকে যাতায়াত করিত না। সে আজ প্রায় ষাট বৎসরের কথা।

আমরা কটকে প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলাম। সুতরাং আমার জ্ঞানের উন্মেষ কটকেই হইয়াছিল। কটকে বালুবাজারে আমাদের বাসা ছিল। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কি একটা চাকরি লইয়া সপরিবারে কটকে গিয়াছিলেন। সপরিবারে—অর্থাৎ তাঁহার মা এবং স্ত্রীকে লইয়া। তাঁহার সঙ্গে আর কেহ ছিলনা, তাঁহাদের দেশে কেহ আত্মীয় ছিলেন কিনা জানি না। বাবার মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা ব্রাহ্ম ছিলেন।

এই নবাগত ব্রাহ্ম পরিবারটি আমাদের বাসা হইতে অনতিদূরে—বালুবাজারেই বাসা লইয়াছিলেন। তিনি যে বাড়ীটা ভাড়া লইয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে অনেক দিন কেহ বাস করে নাই। বাড়ীটা ছোট, দ্বিতল; বাড়ীর পশ্চাতে একটু বাগান ছিল। সে সময় কটকে ভাড়াটিয়া বাড়ী অতি অল্পই ছিল। শুনিয়াছি, বাবা কটকে উপস্থিত হইবার কয়েক বৎসর পরে, সেই বাড়ীর সন্ধান পাইয়া সেই বাড়ীতেই উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উড়িয়া বন্ধুরা তাঁহাকে কিছুতেই সেই বাড়ীতে যাইতে দেন নাই। তাঁহারা নাকি বাবাকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ বাড়ীতে "চিরকুণী"* আছে। বাবা তাঁহাদের সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেও মা উড়াইয়া দেন নাই। তিনি কিছুতেই সেই ভূতের বাড়ীতে যাইতে রাজী হইলেন না, সুতরাং আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম সেই বাড়ীতেই রহিলাম।

যখন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি সেই ভূতের বাড়ী ভাড়া লইতে ইচ্ছা করিলেন, তখনও অনেকে

* উড়িয়া ভাষাতে প্রেতিনীকে 'চিরকুণী' বলে।

তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে সেই বাড়ীতে সাত আট—বৎসরের মধ্যে তিনজন লোক গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। যে ঐ বাড়ীতে বাস করে, তাহারই অনিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম বাবুটি দেবতার অস্তিত্বই উড়াইয়া দিয়াছিলেন; তা অপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবেন কেন? তিনি কাহারও নিষেধে কর্ণপাত করিলেন না, সেই বাড়ীই ভাড়া লইলেন।

তখন কটকে বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুদের শিশু সন্তানগণের মাতৃভাষা শিখিবার কোন স্কুল বা পাঠশালা ছিল না। বাঙ্গালীর ছেলেদিগকেও উড়িয়া বালকদিগের সঙ্গে উড়িয়া ভাষা শিখিতে হইত। সেই ব্রাহ্ম বাবুটি কটকে গিয়া এক মাসের মধ্যেই বাঙ্গালীদের সে অভাব দূর করিলেন। তাঁহার বিদুষী পত্নী সেই বাড়ীতে একটী শিশু পাঠশালা খুলিয়া বাঙ্গালীর ছেলেদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে আমিও সেই পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলাম।

প্রায় ছয়মাস কাটিয়া গেল। আমার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ শেষ হইয়া দ্বিতীয়ভাগও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এমন সময় একদিন সকালে উঠিয়া দেখি বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন, মা নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। ব্যাপার কি? পরে শুনিলাম—কাল রাত্রিতে "কাকী-মা" (আমরা সকলেই সেই ব্রাহ্মিকা শিক্ষয়িত্রীকে "কাকী-মা" বলিয়া ডাকিতাম) গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন! বাড়ীতে মাতা, পুত্র এবং পুত্রবধূ ব্যতীত আর চতুর্থ প্রাণী কেহ ছিল না। ঐ তিন জনের মধ্যে একদিনও কেহ কলহ বিবাদ দেখে নাই। শ্বাশুড়ী সত্য সত্যই বধূঅন্তপ্রাণ ছিলেন। ব্রাহ্মবাবুও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং পত্নীর প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন। এরূপ অবস্থায় সেই শিক্ষিতা মহিলা, মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে, বিদেশে কেন উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিলেন—কেহই সে রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারিল না। ঐ দুর্ঘটনার অল্পদিন পরেই ব্রাহ্মবাবু ছুটী লইয়া দেশে গেলেন। কয়েকমাস পরে আমার বাবাও কটক হইতে বীরভূমে বদলী হইলেন।

আমি এখন আর শিশুও নহি—যুবকও নহি পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে প্রবেশ করিয়াছি। পুত্রদিগের উপরে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তীর্থভ্রমণে বাহির হই। রাজকার্য্যে পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াই ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া পেন্সন পাইয়াছি। আমার পেন্সনে আমার বেশ চলিয়া যাইত, পুত্রেরা আমার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান হইলেও তাহাদের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতাম না—কারণ সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইত না। আমার সহধর্ম্মিণী কখনও বা আমার সঙ্গে আসিতেন, কখনও বা বাটীতে থাকিয়া গৃহিণীপনা করিতেন, আমি একাকী দেশভ্রমণে বাহির হইতাম।

এইরূপ আমি একবার তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। একাকী বলিলে বোধ হয় সত্যকথা বলা হয় না, আমার ভৃত্য গোবিন্দ আমার সঙ্গে ছিল। একটা "ইক্‌মিক্ কুকার" কিনিয়াছিলাম তাহাতেই আমাদের দুইজনের রন্ধন হইত। গোবিন্দ সঙ্গে থাকিলে আমি পৃথিবীর যে কোন দেশে যাইতে পারিতাম—সে আমার এমনই সেবক ছিল।

বৈদ্যনাথ ধামে এক সপ্তাহ বাস করিয়া আমরা কাশী যাইতেছিলাম। বৈদ্যনাথ জংসনে আপ্ ট্রেন আসিল, আমি একটা মধ্য শ্রেণীর কক্ষে স্থান লইলাম এবং গোবিন্দ একটা তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষে আরোহণ করিল। বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াইত, তাই গোবিন্দ তামাক সাজিয়া আমার কক্ষে হুঁকাটা দিয়া গেল। গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলাম গৈরিক পরিচ্ছদ-ধারী এক বৃদ্ধ-যাত্র সেই কক্ষে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার অনুমান হইল যে তাঁহার বয়স সত্তরের কম হইবে না। পরে আলাপ পরিচয় হইলে কথায় কথায় জানিলাম তাঁহার বয়স বিরাশী বৎসর।

তাঁহার বিরাশী বৎসর বয়স শুনিয়া আমি প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আজকাল এই ম্যালেরিয়া পীড়িত বঙ্গদেশে যে আশী বৎসর বয়সের সেরূপ বাঙ্গালী থাকিতে পারে, তাহা আমার ধারনাই ছিল না। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া আমি পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পেন্সন লইলেও আমি রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলাম না। আমার শরীরে বিলক্ষণ শক্তি আছে, এখনও একদিন পদব্রজে ১০।১২ ক্রোশ গমনে কাতর বা ক্লান্ত হই না। আধমণ পঁচিশ সের বোঝা লইয়া দুই এক ক্রোশ যাইতে কাতর হই না। এক কথায় আমার সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবেরা আমার শক্তি ও শরীর দেখিয়া ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আমিও সেই বিরাশী বৎসরের বৃদ্ধ গৈরিকধারীর নিকটে আপনাকে যেন কীট পতঙ্গের মত মনে করিতে লাগিলাম। তাঁহার মত উন্নতকায় বিশাল-বক্ষ, মাংসল-দেহ বাঙ্গালী আমার দৃষ্টিতে কখনও পড়ে নাই। তাহার সেই সুগৌর বিস্তৃত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু, ধীর গম্ভীর অথচ সতেজ কণ্ঠস্বর আমাকে মুগ্ধ করিল।

আমাকে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সেই সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচারী (আমি তাঁহাকে ব্রহ্মচারীই বলিব,কারণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত ওরূপ সুন্দর নীরোগ দেহ হয় না) সহাস্যে বলিলেন—

"আসুন, আপনি কোথায় যাইবেন?"

আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম, "কাশী; আপাততঃ লক্ষ্মীসরাই। মহারাজের কোথায় যাওয়া হইবে?"

"এলাহাবাদ। আপনি আসিলেন ভাল হইল। রাণীগঞ্জ হইতে একাকী মুখ বুজিয়া আসিতেছি। মহাশয়ের নাম?"

আমি আমার নাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনার ব্রহ্মচারীর বেশ দেখিতেছি, আপনি নিশ্চয়ই অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন।"

ব্রহ্মচারী—সহাস্যে বলিলেন—

"তা' করিয়াছি বৈকি। দেশে দেশে ভ্রমণ করাই যখন আমার কার্য্য, তখন অনেক দেশ দেখি নাই—বলিব কিরূপে ?"

"আপনি তামাক খাইবেন কি ?" এই বলিয়া হুঁকাটা তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিলে, তিনি আমার হুঁকা হইতে কলিকাটি মাত্র তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার নিকটস্থ একটা পুঁটুলি হইতে একটা ছোট হুঁকা বাহির করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—

"ভারতের অধিকাংশ নগর এবং তীর্থ বোধ হয় আপনি দেখিয়াছেন।"

তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

"ভারতের এবং ভারতের বাহিরেরও অনেক নগর ও তীর্থ দেখিয়াছি।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল। আমি বলিলাম—

"ভারতের বাহিরে কোন কোন দেশে আপনি গিয়াছেন ?

ব্রহ্মচারী বলিলেন—

"সকল সভ্য দেশেই ঘুরিয়া আসিয়াছি। হিমালয় পার হইয়া তিব্বতে মানস সরোবর দর্শন করিতে যাই। তথা হইতে চীনদেশের ভিতর দিয়া পদব্রজে কাণ্টন নগরে যাই। কাণ্টন হইতে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকায় চিলি, পেরু, ব্রেজিল তথা হইতে উত্তর আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে যাই। আমেরিকা হইতে ইউরোপে আসিয়া প্রায় সকল দেশেই কিছুদিন ধরিয়া বাস করি। পরে তুরস্কের ভিতর দিয়া এশিয়া মাইনর পার হইয়া মক্কা তীর্থে গমন করি। মক্কা হইতে মিশর দেশে গিয়া তথায় তিনমাস বাস করি। পরে মিশর হইতে ষ্টীমারে করিয়া পারস্য দেশে যাই সেখান হইতে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া আবার ভারতে আসি। কেবল জাপানে ও সাইবেরিয়াতে যাই নাই। একবার যাইবার ইচ্ছা আছে।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আমিত অবাক্। বিরাশী বৎসরের বৃদ্ধ বলেন "কিনা সাইবিরিয়াতে যাইবার ইচ্ছা আছে!" ইনি মানুষ না কি ?

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আমি বলিলাম—

"আপনার কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। কোন বাঙ্গালী যে পৃথিবীর সকল দেশে এরূপ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহা আমার জানা ছিল না। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আপনার জীবনের দুই চারিটি ঘটনা বলিলে কৃতার্থ হইব।"

তিনি বলিলেন—

"এই বৃদ্ধের সুদীর্ঘ জীবন কাহিনী সংক্ষেপে বলিতে হইলেও দশ পনর দিন লাগিবে। আমি একটা ঘটনার কথা বলি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, আমি "অভিশপ্ত ইহুদীর" মত কেন দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহার হুঁকা হইতে কলিকাটি খুলিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—

আপনি লক্ষ্মী-সরাই পর্য্যন্ত যাইবেন। সুতরাং সংক্ষেপেই বলিতে হইবে।"

৩

ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন :—

"আমার জন্মস্থান চব্বিশ পরগণার কোন গণ্ডগ্রামে। আমি বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া আমার মামার বাড়ীতে মানুষ হইয়াছিলাম। মামা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আমাকে বাল্যকালে সংস্কৃত পড়াইয়াছিলেন। যখন আমার বয়স পনর বৎসর সেই সময় আমার মামারও মৃত্যু হইল। পর বৎসর আমার বিবাহ দিয়া আমার মামীমাও পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তখন এক শ্বশুর বাটী ব্যতীত অন্য কোথাও আশ্রয় রহিল না। কিন্তু আমি শ্বশুর বাটীতে ঘর জামাই হইয়া থাকা অপেক্ষা গাছতলায় বাস করা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিতাম। সেইজন্য আমি শ্বশুর বাটীতে না গিয়া মামাদের গ্রামের এক কায়স্থ ভদ্রলোকের সহিত কলিকাতায় যাইলাম।

আমার শ্বশুর বাড়ীও চব্বিশ পরগণায়—সে গ্রাম কলিকাতা হইতে তিন চার ক্রোশ হইবে। সেই জন্য কলিকাতায় অবস্থানকালে তিন চারি মাস অন্তর একদিন করিয়া শ্বশুর বাটীতে যাইতাম যখন আমার বিবাহ হয়, তখন আমার স্ত্রী যশোদার বয়স দশ বৎসর মাত্র। কলিকাতায় সেই কায়স্থ ভদ্রলোকের বাটীতে থাকিয়া আমি তাঁহার বাজার হাট করিতাম, পাচক ব্রাহ্মণ না থাকিলে মধ্যে মধ্যে রন্ধন করিতেও হইত, তব সেটা কদাচিৎ। তাঁহার বাসাতে থাকিয়া আমি ইংরাজী ও পার্শী পড়িতে লাগিলাম। বাল্যকালে আমি বেশ বুদ্ধিমান ছিলাম, পাঠেও আমার মনোযোগ ছিল। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইংরাজী ও পার্শী আয়ত্ত করিলাম। পার্শী শিখিলে তখন আদালতে সহজেই চাকরী মিলিত, সেই জন্যই আমি পার্শী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

সেই কায়স্থ ভদ্রলোক কলিকাতায় সরকারী অফিসে কার্য্য করিতেন। আমার পাঠে আগ্রহ দেখিয়া তিনিও আমাকে যত্ন করিয়া পড়াইতেন। কলিকাতায় যাইবার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি আমাকে তাঁহারই আফিসে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে একটা চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। আমার মুরুব্বি যে অফিসে চাকরি করিতেন, সেটা মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট; তিনি কমিসরিয়াটের গোমস্তা ছিলেন।

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। কলিকাতায় এই তিন বৎসর মাত্র ছিলাম। সেই তিন বৎসরের মধ্যে বোধ হয় পাঁচ-সাতবার শ্বশুর বাটীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু শ্বশুর বাটীতে গিয়া কখনও দুই রাত্রির অধিক যাপন করি নাই। আমার শ্বশুর শাশুড়ীর ব্যবহার কেমন আমায় ভাল লাগিত না। মনে হইত তাঁহারা অত্যন্ত স্বার্থপর ও নীচমনা। কিন্তু যশোদার কোন কথায় বা ব্যবহারে আমি স্বার্থপরতা বা নীচতার পরিচয় পাই নাই। সেটা প্রকৃত, কি তাহার প্রতি আমার একান্ত অনুরাগ বশতঃ, তাহা আমি বলিতে পারি না। যশোদা অত্যন্ত রূপবতী ছিল। সকলেই বলিত যে তাহার মত রূপবতী বালিকা সে গ্রামে কেহ ছিল না।

কলিকাতায় তিন বৎসর কাল বাস করিবার পরই আমাদিগকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে

হইল। একদিন অফিসে গিয়া শুনিলাম পশ্চিমে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে শান্ত বা দমন করিবার জন্য আমাদের বড় সাহেবকে সদলবলে পশ্চিমে যাইতে হইবে। বাল্যকাল হইতেই দেশ ভ্রমণে আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল, তাই এই সংবাদে আমার বড়ই আনন্দ হইল। আমার মুরুব্বি মহাশয় কিন্তু অত্যন্ত বিষণ্ণ চিত্তে পশ্চিমে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মাত্র এক সপ্তাহ পরেই আমাদিগকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইল। সেই এক সপ্তাহ আমরা এত ব্যস্ত ছিলাম যে একদিনের জন্যও যশোদার সহিত দেখা করিতে যাইতে পারিলাম না। অগত্যা আমার শ্বশুর মহাশয়কে, পত্রদ্বারা আমাদের পশ্চিমে যাত্রার কথা জানাইয়া আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিলাম। তখন যশোদা চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র।

কলিকাতা হইতে আমরা প্রথমে দানাপুরে, পরে এলাহবাদ, কানপুর লক্ষ্ণৌ-মীরাট, দিল্লী প্রভৃতি কত স্থানেই যে ছুটা-ছুটি করিলাম তাহার স্থিরতা নাই। মিউটিনীর কথা আপনারা সকলেই জানেন, সে ভয়াবহ ব্যাপারের বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। লক্ষ্ণৌনগরে অবস্থান কালে আমার অভিভাবক, সেই কায়স্থ ভদ্রলোক, বসন্তে মারা পড়িলেন। তখন উপযুক্ত লোকের অভাবে আমাদের বড় সাহেব আমাকেই সেই বাবুর পদে নিযুক্ত করিলেন, আমি কমিশারিয়টের গোমস্তা হইলাম।

প্রায় একবৎসর পরে বিদ্রোহের দমন হইল। বিদ্রোহ শেষ হইলেও আমার প্রবাস শেষ হইল না। যতদিন পর্যান্ত দেশে সম্পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত না হইল, ততদিন আমাদিগকে পশ্চিমে থাকিতে হইল। মোটের উপর কলিকাতা ত্যাগের পর প্রায় পাঁচ বৎসর আমি পশ্চিমে ছিলাম। কমিশরিয়টের গোমস্তার বেতন যাহাই হউক না কেন, উপরি রোজগার যথেষ্ট ছিল, আমিও যে কেবল বেতনের উপরেই নির্ভর করিয়াছিলাম তাহা নহে; সুতরাং মোটের উপর ঐ পাঁচ বৎসরে আমি প্রায় দুই লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম।"

৪

একটা ষ্টেশনে—বোধ হয় মণ্ডয়াড়ীতে—গাড়ী থামিলে গোবিন্দ আর এক কলিকা তামাকু দিয়া গেল। আমি ব্রহ্মচারীকে কলিকাটা দিলে তিনি ধূমপান করিয়া আমাকে কলিকা দিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"পাঁচ বৎসরের পর আমাদের আফিস কলিকাতায় আসিল। আমি কুড়ি টাকার বেতনের কেরাণীরূপে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলাম, লক্ষপতি হইয়া কলিকাতায় পুনঃ প্রবেশ করিলাম। কলিকাতায় আসিয়াই একটা বাসা স্থির করিলাম এবং দুই তিন দিনের মধ্যে বাসা গুছাইয়া আফিস হইতে তিন দিনের ছুটী লইয়া যশোদাকে আনিবার জন্য শ্বশুর বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমি আমার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে কোন পত্র পাই নাই, পাইবার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ তখন ডাক বিভাগে এখনকার মত সুন্দর



'ভৃগু-পদাঘাত' শিল্পী—অলীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বন্দোবস্ত ছিল না, আমিও কোন্ দিন কোথায় থাকিতাম তাহারও ঠিক ছিল না। তবে আমি সুবিধা পাইলেই মধ্যে মধ্যে শ্বশুরবাটীতে পত্র দিতাম। সে পত্র তিনি পাইতেন কি না জানি না, কারণ তখন প্রায়ই ডাক মারা যাইত।

পশ্চিমে মিউটিনির সময় আমি নামমাত্র মূল্যে দুইখানা বেনারসী সাড়ী কিনিয়াছিলাম তাহার উচিৎ মূল্য বোধ হয় পাঁচশত টাকার কম নহে। যশোদার জন্য প্রায় দুই হাজার টাকার গহনাও গড়াইয়াছিলাম। কলিকাতায় বাসা ঠিক করিয়া একদিন আফিস হইতে সকাল সকাল ছুটী লইয়া যশোদাকে আনিবার জন্য শ্বশুর বাটি যাত্রা করিলাম। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম পাঁচ বৎসরে গ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যেখানে বাগান ছিল সেখানে অট্টালিকা হইয়াছে, যেখানে পর্ণকুটীর ছিল সেখানে কলাবাগান হইয়াছে। আমার শ্বশুরের খড়ের ঘর ছিল, গিয়া দেখিলাম তাঁহারও দুই তিনখানা পাকা ঘর হইয়াছে। আমি কলিকাতায় আসিয়াই আমার শ্বশুরকে পত্রদ্বারা আমার আগমন সংবাদ দিয়াছিলাম এবং শীঘ্রই যে যশোদাকে কলিকাতায় লইয়া আসিব তাহাও জানাইয়াছিলাম।

শ্বশুর মহাশয়ের পাড়াতে উপস্থিত হইলে, আমাকে দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইল, কেহ বা কেমন একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সরিয়া গেল। দুই একজন বৃদ্ধ কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াই চলিয়া গেল, অধিক কথা কহিল না। আমি শ্বশুর বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র বাটীর মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। হাতের ব্যাগটা—সেই গহনা ও বেনারসী কাপড় শুদ্ধ ব্যাগটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। শুনিলাম আমার শ্বাশুড়ী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন—"ওরে যশোদা রে মারে—কোথায় গেলিরে—!" ব্যাপারটা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না যে যশোদা নাই। আমার শ্বশুর চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া আমাকে বলিলেন—'এস বাবা ভিতরে এস, যশি আজ এক বৎসর হ'ল আমাদের ছেড়ে পালিয়ে গেছে।'

আমার তখন মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা আপনি অনুমান করিতে পারেন, ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। সংক্ষেপেই বলি যে আমি আর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম না। শ্বশুরের মুখে শুনিলাম যে চৌদ্দ দিনের বাতশ্লেষ্মা বিকারে যশোদা এক বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছে। তাহার মৃত্যু সংবাদ তাঁহারা পত্রদ্বারা আমাকে জানাইয়াছিলেন, সে পত্র আমি পাই নাই।

শ্বশুরের মুখে সমস্ত শুনিয়া আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না; ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া আমি শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করিয়া সেই ধূলা পায়েই আবার কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সে গ্রাম ছাড়িয়া প্রায় আধ ক্রোশ দূরে অন্য একখানা গ্রামে প্রবেশ করিয়া ক্লান্তি বোধ হইল। আমি একটা ময়রার দোকানে গিয়া বিশ্রাম করিলাম এবং মুখ হাত ধুইয়া কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া ভোজন করিলাম। ক্ষুধা বা খাইবার স্পৃহা ছিল না, দোকানে আশ্রয় লইয়া কিছু না কিনিলে ভাল দেখায় না তাই কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া খাইলাম।

আমি জীবনপুর হইতে আসিতেছি শুনিয়া দোকানদার বলিল 'আপনার বাড়ীত জীবনপুরে নয়, আমিত জীবনপুরের সকলকেই চিনি।'

আমি বলিলাম—'আমার বাড়ী কলিকাতায়, জীবনপুরে একটি লোকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম, দেখা হইল না তাই ফিরিয়া যাইতেছি।'

দোকানদারের মুখে জীবনপুরের সম্বন্ধে কথা হইতে হইতে আমি যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। দোকানদার বলিল জীবনপুরে আর ভদ্রলোকের বাস করা চলে না। যেমন হয়েছে জমিদার তেমনই হয়েছে অন্য লোকে। হরিশ বাঁড়ুয্যে (আমার শ্বশুর) যে কাণ্ডটা করেছে, তা' শুনলে কাণে আঙুল দিতে হয়।'

হরিশ বাঁড়ুয্যে কি করেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে সে যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে হরিশ বাঁড়ুয্যে তার বড় মেয়ে যশোদাকে গাঁয়ের জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে দিব্বি কোটা ঘর করে নিয়েছে। মেয়েটা খুব সুন্দরী ছিল, তার বর পশ্চিমে গিয়ে নাকি লড়ায়ে মারা পড়েছে। ভগবান জানেন, সে কথা সত্যি কি মিথ্যে মেয়েটার বয়স যখন ষোল সতের বছর, সেই সময় জমিদার শৈলেশ্বর বাবুর নজর তার উপর পড়ে। বুড় বাঁড়ুয্যে তাই জান্তে পেরে মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করে জমিদারকে নিজের বাড়ীতে ডেকে আনে। সে সময় বাঁড়ুয্যের সুখের আর সীমা ছিল না, রোজ রোজই বাবুদের বাড়ী থেকে বড় বড় মাছ, ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা খাবার বাঁড়ুজ্যের বাড়ীতে আসত। আজ বছর খানেক হ'ল বাবু সেই মেয়েটাকে নিয়ে কল্‌কাতায় চলে গেছে। মেয়েটা বুঝি পোয়াতি হয়েছিল। এখন আবার শুন্‌ছি বাঁড়ুয্যের জামাই মরেনি, বেঁচে আছে। ভদ্দর লোকের কথাই আলাদা। আমরা ছোট লোক, আমাদের ঘরে এরকম হলে গাঁয়ের লোকে চাল কেটে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিত।

একখানা চল্‌তি ঘোড়ার গাড়ী পাইয়া আমি রাত্রিতেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন আফিসে গিয়া কাজে ইস্তফা দিলাম এবং সেই জমিদার শৈলেশ্বর ঘোষকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অনন্যকর্ম্মা হইয়া লাগিয়া গেলাম। কত চর লাগাইলাম, নিজে কতস্থানে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। এক বৎসর চেষ্টায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

৩

ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন :—

"শৈলেশ্বরকে ও যশোদাকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমার জীবনের ব্রত হইল। কেন যে তাহাদিগকে খুঁজিতে ছিলাম, তাহা আমি একদিনও ভাবিয়া দেখি নাই। যে জন্যই হউক, তাহাদিগকে বাহির করিতেই হইবে, ইহাই আমার সঙ্কল্প হইল।

আমি যে সমস্ত গহনা ও মূল্যবান বস্ত্রাদি আনিয়াছিলাম, তাহা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম



'মন্দিরে' শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

আমার যাহা কিছু অস্থাবর, সম্পত্তি ছিল, তাহাও বিক্রয় করিয়া দুই লক্ষ টাকারও অধিক হইল। আমি ব্যাঙ্কে দুই লক্ষ টাকা জমা রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা লইয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইলাম। কলিকাতায় একজন বড় এটর্ণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একখানা উইল করিলাম এবং তাঁহাদিগকে ও ব্যাঙ্কে জানাইলাম যে যদি এক বৎসর কাল আমার নিকট হইতে কোন সংবাদ তাঁহারা না পান, তাহা হইলে আমার উইল অনুসারে কার্য্য হইবে।

কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া আমি নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া পুরীধামে গমন করি। তথায় কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া কলিকাতায় আসিবার পথে কটকে যাই; কটকের একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পুরীতে আমার আলাপ হইয়াছিল, কটকে যাইলে তিনি অতি সমাদরে তাঁহার বাসাতে আমাকে আশ্রয় দিলেন। সেইখানে অন্যান্য বাঙ্গালী বাবুদের সঙ্গেও আমার আলাপ হইল।"

আমি এক মনে ব্রহ্মচারীর কাহিনী শুনিতেছিলাম, তিনি কটকে ছিলেন শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

"কটকে আপনি কোথায় থাকিতেন?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "চৌধুরী বাজারে। আপনিও কটকে গিয়াছিলেন নাকি?"

আমি বলিলাম "হাঁ সে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, তখন আমি শিশু।"

ব্রহ্মচারী বলিলেন "আমি তাহারও পূর্ব্বে কটকে গিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ তখন আপনার জন্মই হয় নাই। হাঁ, বলিতেছিলাম—কটকে গিয়া যে সকল বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হইল, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম শুনিলাম—শৈলেশ্বর বাবু। উপাধিও শুনিলাম ঘোষ। একদিন কথায় কথায় তাঁহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—কলিকাতায় তাঁহার নিবাস। তাঁহার কথা শুনিয়া হতাশ হইলাম বটে, কিন্তু কেমন যেন মনে হইতে লাগিল ইনিই সেই শৈলেশ্বর। পরদিন আমি কথায় কথায় শৈলেশ্বর বাবুকে, জীবনপুরের পার্শ্ববর্ত্তী একটা গ্রামের নাম বলিয়া বলিলাম···গ্রামে আমি একবার বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমার কথা শুনিয়া শৈলেশ্বর বাবু বলিলেন, 'সে গ্রামত আমাদের গ্রামের পার্শ্বেই, আমার বাটী কলিকাতা হইতে চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী জীবনপুর।'

আর আমার কোন সন্দেহ রহিল না। আমি আর কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। অন্যান্য বাবুদের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম শৈলেশ্বর বাবু ও তাঁহার স্ত্রী কটকে প্রায় ছয় মাস বাস করিতেছেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হইয়াছে, তাঁহার আর সন্তানাদি হয় নাই। শৈলেশ্বরের স্ত্রী যশোদা কিনা, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইল। জগদীশ্বর অচিরে সে কৌতূহলও পূর্ণ করিলেন। একদিন এক বাঙ্গালীবাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, কটকের যাবতীয় বাঙ্গালী বাবু সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইলেন। আহারাদির পর যখন শৈলেশ্বর বাবুর স্ত্রী বাসাতে প্রত্যা-

কালো ছেলে

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সনৎকুমারের সম্বন্ধে লোক বলাবলি করিত—লোকটার সবই বিস্ময়কর। তাহার পঠদ্দশায় তাহার অসাধারণ সাফল্যে লোক বিস্মিত হইত—কোন পরীক্ষায় সে প্রথম ব্যতীত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নাই। তাহার পর ব্যবসায়ে তাহার সাফল্যও অসাধারণ ছিল। সে বিষয়ে পিতা শরৎকুমারের "পাতরচাপা" কপাল পুত্র সনৎকুমারের সময় "পাতাচাপা" হইয়াছিল। আবার তাহার উপার্জ্জন যেমন বিস্ময়কর ছিল, তাহার দান তদপেক্ষাও বিস্ময়কর হইয়াছিল। কেহ বলিত, "ব্যবসায় জোয়ার ভাঁটা আছে, না বুঝিয়া এত খরচ করিয়া শেষে কিন্তু লোকটা কষ্ট পাইবে।" কেহ বা বলিত, "অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নহে, কথায় বলে—

'অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানেচ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্॥'

সে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছে।" তাহার অন্য ব্যবহারও বিস্ময়কর—সংসারে তাহার ছিলেন কেবল মা—তিনিও তীর্থবাস করিতেন। সে বিবাহ করে নাই; তাহার ছিল কেবল—ব্যবসা আর অধ্যয়ন; এই উভয়ের মধ্যে সে যেন ডুবিয়া থাকিত। ব্যবসায়ে যাহার লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ—যে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে, সে যে ব্যক্তিগতভাবে সাংসারিক সুখের কামনা পর্য্যন্ত করে না, ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইত। তাহার দানের বৈশিষ্ট্য যাহারা লক্ষ্য করিতে পারিত তাহারা তাহাতেও বিস্মিত হইত। তাহার দানে যত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সবই বালকবালিকার জন্য, আর সবই তাহার পিতৃনামে উৎসৃষ্ট। লোক ভাবিত, তবে কি অকৃতদার এই ধনীর মনে সংসারের শ্রেষ্ঠসুখ সন্তানলাভের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা গোপন থাকিলেও এত প্রবল যে তাহার দানের মধ্যে তাহা আর আত্মগোপন করিতে পারে না? অথচ সে বিবাহ করে নাই—যাহাকে কন্যা দিবার জন্য লোকের আগ্রহের অন্ত ছিল না, সে সে কথায় কখন কর্ণপাত করে নাই! আর কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা করিয়াছিল, বিবাহিত কর্ম্মচারীদের বেতনের হার অধিক হইবে এবং তাহারা পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র টাকা মাসে মাসে পাইবে!

সনৎকুমারের বাল্যের বন্ধু বা ব্যবসায়ের পরিচিত কেহই তাহার জীবনের রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারিত না; কেহই জানিত না—সে রহস্যের উদ্ভেদ করিলে কি দারুণ বেদনার মর্ম্মন্তুদ কথা জানিতে পারা যায়—তাহার বুকের মধ্যে মানুষের কি প্রবল কামনা স্বেচ্ছায় আপনার সব ত্যাগ স্বীকার করিয়া—ত্যাগের শরশয্যায় শয়ন করিয়া আছে।

মানবচরিত্র যিনি নখদর্পণে দেখিতেন—মহাকবি কালিদাসের সেই টীকাকার মল্লিনাথ বিবাহে কে কি চাহে তাহার কথায় বলিয়াছেন :—

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতাবিত্তং পিতা শ্রুতং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥"

এই শ্লোকে যে সত্য নিহিত আছে, আমরা আজকাল তাহা ভুলিয়া যাই এবং ভুলিয়া অনেকস্থলে কষ্টের কারণ ডাকিয়া আনি। কন্যার দিকটা দেখা আমরা প্রয়োজন মনে করি না—সে যে স্বামীর একটা আদর্শ মনে মনে গঠিত করিতে পারে, সে যে সে আদর্শের অপহ্নবে হতাশ হইতে পারে এবং সেই হতাশা তাহার তরুণ হৃদয়ে স্বামীর প্রতি প্রেমবিকাশে বিষম বিঘ্ন ঘটাইতে পারে,—রূপের প্রতি তাহারও যে আকর্ষণ থাকিতে পারে, তাহা আমরা মনে করি না; যেন তাহার স্বতন্ত্র সত্তাই নাই—সে স্বামীকে ভালবাসিবেই—বিবাহ-সংস্কার তাহার কাছে স্বামীকে সুন্দর দেখাইবেই। তাই ছেলে কালো কুচ্‌কুচে হইলেও আমরা তাহার জন্য "ধরণে চন্দ্রকণা" বধূর সন্ধান করি; বৈষম্যের বিষম ফলের সম্ভাবনাও কল্পনা করিতে পারি না। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা ক্রমে বিকশিত হইতে পারে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা যদি প্রথমেই বিকশিত না হয়, তবে—পরে তাহার বিকাশ-সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। কেননা, পুরুষের আসঙ্গলিপ্সা সক্রিয়, তাহা হইতে আকর্ষণ ও আকর্ষণ হইতে ভালবাসা উদ্ভূত হইতে পারে। নারীর আসঙ্গলিপ্সা নিষ্ক্রিয়—ভালবাসা হইতে তাহার উদ্ভব সম্ভব—তাহা হইতে ভালবাসার উদ্ভব সম্ভব নহে।

ছেলেমেয়ের বিবাহে অনেকে যে ভুল করেন, সনৎকুমারের পিতা শরৎকুমারের পিতা সতীশচন্দ্র ও প্রতিমার পিতা ধীরেশচন্দ্র উভয়েই সেই ভুল করিয়াছিলেন।

ধীরেশচন্দ্র প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন—কলিকাতায় তাঁহার বড় কারবার, মফঃস্বলে নানাস্থানেও গদী। যে যাহা পায় না, তাহার প্রতি তাহার একটা অকারণ আকর্ষণ থাকে। পিতার মৃত্যুতে তাঁহাকে যৌবনেই বিদ্যালয় ছাড়িয়া কারবারের কর্তা হইয়া বসিতে হইয়াছিল—লক্ষ্মীর কৃপা তিনি যথেষ্ট পরিমাণেই লাভ করিয়াছিলেন—সরস্বতীর সাধনা তিনি করিতে পারেন নাই। সে দুঃখ তিনি যেন ভুলিতে পারেন নাই; ছেলেদের জন্য জোড়া জোড়া শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং প্রতিমার বিবাহে বিদ্বান দেখিয়াই বর বাছিয়াছিলেন। ব্যবসার সূত্রে শরৎকুমারের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল এবং শরৎকুমার তাঁহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্র পিতামাতার এক সন্তান। তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁহার তরুণ যৌবনে যখন তাঁহার পত্নী একমাত্র পুত্র শরৎকুমারকে রাখিয়া পরলোক গত হয়েন, তখন তিনি সেই পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলেন, তাহাকে লালন পালন করাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। পুত্রের প্রতি তাঁহার মনোযোগ যত বাড়িয়াছিল, ব্যবসার প্রতি

মনোযোগ তত কমিয়াছিল। কাজেই ছেলে যেমন "মানুষ" হইয়া উঠিয়াছিল, ব্যবসা তেমনই "মন্দা" পড়িয়াছিল। পুত্রের সাফল্যে পিতা ব্যবসার শ্রীনাশে দুঃখানুভব করেন নাই।

পুত্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায়ও সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল এবং প্রশংসা ও পুরস্কার প্রচুর পরিমাণেই অর্জ্জন করিল, তখন তিনি আবার ব্যবসার দিকে মন দিলেন। কিন্তু ব্যবসার অবস্থা তখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, অসাধারণ চেষ্টা ব্যতীত তাহার শ্রী ফিরান সম্ভব নহে। সেই চেষ্টার শ্রমে যখন তিনি অবসন্ন তখন ব্যবসার জন্য আসামে যাইয়া তিনি কালাজ্বর লইয়া আসিলেন।

দীর্ঘ ছয় মাস রোগ-ভোগ করিয়া সতীশচন্দ্র বুঝিলেন, রোগ সারিবার নহে। তিনি আপনার রোগ-শয্যায় পড়িয়া যখন মনের মধ্যে একটা অতৃপ্ত বাসনার সন্ধান পাইলেন—শরৎকুমারকে সংসারী করিয়া যাইতে হইবে—ঠিক সেই সময়ে ধীরেশচন্দ্রের পক্ষ হইতে প্রতিমার সঙ্গে শরৎকুমারের বিবাহের প্রস্তাব আসিল।

নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র সতীশচন্দ্র ধারণাই করিতে পারিতেন না—বিবাহ করিয়া কেহ অসুখী হইতে পারে। বিশেষ এ সম্বন্ধ সকল দিকেই স্পৃহনীয়; কারণ, শ্বশুর ছেলের মুরুব্বী হইবেন এবং ধীরেশচন্দ্রের কন্যার রূপের খ্যাতি ছিল। তিনি এক কথায় সম্মতি দিলেন।

ধীরেশচন্দ্র ছেলেটির গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সে বিদ্যায় যেমন—বুদ্ধিতেও তেমনই, আবার বিনয়ে ও পিতৃভক্তিতেও বুঝি অপরাজেয়। পীড়িত পিতার রোগে সে যেরূপে তাঁহার সেবা করিত, মাও বুঝি পীড়িত পুত্রকে তেমন ভাবে সেবা করিতে পারেন না। তিনি ব্যবসায়ে সফল—বৃহৎ পরিবারের ও বৃহত্তর ব্যবসার কর্ত্তা; সব বিষয় তাঁহাকে আপনি ভাবিয়া স্থির করিতে হয়—কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে বিলম্ব করিলেও চলে না। তিনি এ বিবাহে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না—কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

২

ধীরেশচন্দ্র ভুল করিলেন। তাহার প্রথম ফল তিনি জানিতে পারিলেন, "পাকা দেখা"র দিন। "পাকা দেখা" দেখিয়া তাঁহার গৃহিণীর ভ্রাতা আসিয়া সংবাদ দিলেন, ছেলে কালো। গৃহিণী কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা ছেলে না কি কালো?"

ধীরেশচন্দ্র বলিলেন, "তা' হ'লেই বা!"

"রমাই বল্‌ছে, খুব কালো। অমন মেয়ের কি ঐ যুগ্যি বর!"

ধীরেশচন্দ্র বিরক্ত হইলেন। তাঁহার শ্যালক রমাই ফোর্থ ক্লাস অবধি পড়িয়াই পূর্ণচ্ছেদ টানিয়াছিল এবং ভগিনীপতির সুপারিশে একটা আফিসে ঢুকিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "কালো ত মেয়ের যুগ্যি হ'বে না। কিন্তু রাঙ্গা মূলো নিয়ে—তা'র পর?"

এই কথায় রমাইয়ের উপর যে কতটা আঘাত ছিল, তাহা বুঝিয়া গৃহিণী নিরস্ত হইলেন বটে,

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাগও খুব করিলেন। রাগে তিনি গর গর করিতে লাগিলেন। তবে তিনি স্বামীর মেজাজ জানিতেন, তাই চুপ করিয়া গেলেন। বাড়ীতে আর সকলেও কাণাকাণি করিতে লাগিল—কিন্তু কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। যেন ঝড়ের আগে গুমট দেখা গেল।

ঝড় উঠিল, যে দিন গায়হলুদের তত্ত্ব নিয়া ঝি-চাকরের পল্টন ফিরিয়া আসিল। তাহারা বলিতে লাগিল—"ওমা, দিদিমণির ঐ বর!" ছেলে কালো—বাড়ী ছোট—লোকজন কম। এ সবই প্রতিমার মা'র জামাইয়ের আদর্শের বিরোধী। তিনি যাইয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন; মেয়ের সম্মুখেই বলিয়া ফেলিলেন—"এর চেয়ে মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিলেই আমিও নিশ্চিন্তি হ'তাম, ও-ও বাঁচত—কাউকে আর মেয়ের দায় পোহাতে হ'ত না।"

প্রতিমার যে বয়স তাহাতে তাহার এই কথা বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নহে। মা কন্যার প্রতি স্নেহবশে কন্যার হৃদয়ে অসুখের বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিলেন—ফলের কথা মনে করিবার অবসর তখন তাঁহার ছিল না।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইতেও বিলম্ব হইল না। বিবাহের দিন বর দেখিয়া কন্যার মাতা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মাতা ও পিসীমা প্রভৃতি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন—"শুভ কাযে নিশ্বেস ফেল্‌তে নেই। হ'লই বা রং ময়লা—মুখ চোখ গড়ন বেশ ত! বেটাছেলের রূপ বিদ্যায়—তা'র ত আর কম নেই।"

মেয়ের মা বলিলেন, "সবই মেয়ের অদেষ্ট—নইলে কর্তার অমন পছন্দ হ'বে কেন?"

সমাগত মহিলাদের গুঞ্জন যে শরৎকুমারের কর্ণগোচর হইল না, এমন নহে। কিন্তু সে সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিল না।

মেয়ের মা বুঝিলেন, "এ ত আর বদলাবার নয়!" তাহাই বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন। মন কতটা প্রবোধ মানিল বলিতে পারি না, তবে প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া তিনি জামাতাকে আদর যত্ন করিবার চেষ্টা করিলেও সে মনোভাব ধীরেশচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন এবং স্নেহে, যত্নে, উপহারে, সর্বদা সংবাদ লওয়ায়—গৃহিণীর পক্ষের ত্রুটি পূর্ণ করিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অল্প বয়সে মাতৃহীন—পিতার বক্ষে পালিত—শরৎকুমার শাশুড়ীর স্নেহত্রুটি অনুভব করিতে পারিল না। বিশেষ সে যৌবনের আবেগে স্ত্রীকে ভালবাসিত, সেই ভালবাসাই তাহার কাছে—শ্বশুর বাড়ীর সব ত্রুটি ঢাকিয়া দিত। তাহার কাজেরও অন্ত ছিল না—পিতার জীবনস্রোত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার ভার সে ভাড়াটিয়া শুশ্রূষাকারীর হাতে দিতে পারিত না; আপনিই তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। ব্যবসাও তাহাকেই দেখিতে হইত। এ অবস্থায় সে আপনার ভালবাসায় আপনি আনন্দ ও সুখ পাইত।

তাহার পর পিতার মৃত্যু হইল। শরৎকুমারের পক্ষে তিনি কেবল পিতা ছিলেন না,

পরন্তু বন্ধু, সখা, আরাধ্য দেবতা, পিতা, মাতা—একাধারে এই সব ছিলেন। কাযেই তাঁহার মৃত্যু তাহার পক্ষে বিষম শোকের কারণ হইল। তাঁহার মৃত্যুতে সে যে অভাব অনুভব করিল, নবলব্ধ প্রেমে তাহা পূর্ণ করিতেই প্রয়াস করিতে লাগিল—সংসারে ও হৃদয়ে স্ত্রী ব্যতীত তাহার আর কোন আকর্ষণই রহিল না।

৩

স্বামীর কাছে প্রতিমা যাহা পাইল, তাহা সুলভ নহে; কিন্তু সে কিছুতেই তাহা মূল্যবান বলিয়া মনে করিতে পারিল না। তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সে সব তাহার অবশ্য-প্রাপ্য। স্বামীর নিকট হইতে সে তাহা পাইবারই অধিকারী। তাহার মা যে কখনই মনে করিতে পারেন নাই, জামাতা দুহিতার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহা সে কখন ভুলিতে পারিত না এবং বিন্দুমাত্র অম্ল যেমন পাত্রপূর্ণ দুগ্ধ বিকৃত করিয়া ফেলে, সেই ধারণা তেমনই স্বামীর প্রতি তাহার স্বাভাবিক মনোভাব বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার ধারণাও কালের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রভ না হইয়া উজ্জ্বল হইবার কারণ ঘটিতে লাগিল। প্রথম কন্যার বিবাহে ধীরেশচন্দ্র সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, তাহার ফল জামাতাকেও ভোগ করিতে হইল, তখন তিনি স্রোতে দেহ ভাসাইলেন—পরের কন্যাগুলির বিবাহে গৃহিণীর ইচ্ছানুসারে পাত্রদের গুণের স্থান রূপকে অধিকার করিতে দিলেন।

স্বামীর সম্বন্ধে প্রতিমা ইহাও বুঝিয়াছিল যে, সে যাহাই কেন করুক না—স্বামীকে হারাইবার ভয় নাই। স্বামীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ—রোগ যেন তাহা স্পর্শ করিতে পারে না; স্বামীর পত্নীর প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ়—তাহার যেন হ্রাস হইতে পারে না। হারাইবার ভয় না থাকিলে অনেক সময় প্রাপ্ত বস্তুর মূল্যও বুঝা যায় না। প্রতিমারও তাহাই হইয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর ব্যবসার ব্যাপার লইয়া শরৎকুমারকে বিব্রত হইতে হইল—তাহার জন্য অনেকটা সময় ব্যয় করিতে হইত; কিন্তু তাহার যত কাযই কেন থাকুক না—যত চিন্তাই কেন থাকুক না, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাই তাহার সকল কাযের উৎস ছিল, সকল চিন্তাকে ম্লান করিত। এক এক দিন আফিসে অতি প্রয়োজনীয় কায সারিয়াই সে অসময়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিত। প্রতিমা সবিস্ময়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কি উত্তর দিবে বুঝিতে পারিত না; ভাবিত, প্রতিমা কি অনুমান করিতে পারে না, সে কেবল তাহারই জন্য আসিয়াছে? প্রতিমা কি তাহার প্রতি কখন সেরূপ আকর্ষণ অনুভব করিতে পারে না? সে হয় ত বলিত, "তুমি একলাটি আছ, একটু অবসর পেলাম—তাই এলাম।" সে কথায় যখন প্রতিমার মুখে চক্ষুতে হর্ষদীপ্তির পরিবর্তে উপহাসের অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিত, তখন শরৎকুমার বিষম বেদনা অনুভব করিত। সে ভাবিত—কেন এমন হয়? সে তাহার হৃদয়ে প্রতিমার জন্য যে ভালবাসা অনুভব করে, প্রতিমার হৃদয়ে তাহা অনুভূত হয় না কেন? যে সব কবি বলেন,

প্রেমিক ভালবাসিয়াই সুখ পায়—প্রতিদানের প্রত্যাশা করে না, তাঁহাদের কথা যেমন সত্য তেমনই ভুল। মানুষ যে ভালবাসে, তাহার ভালবাসা প্রেমাস্পদের প্রেমের বিকাশাপেক্ষা রাখে না সত্য, কিন্তু ভালবাসা যেমন সুখের, প্রতিদান না পাইলে আবার তাহা তেমনই দুঃখের; কেন না, অভিমান ভালবাসার নিত্যসহচর। ভালবাসার প্রতিদান না পাইয়া মানুষ আত্মহত্যা করে। নৈতিক জীবনের আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া পাপের পথে হীন উত্তেজনায় আপনার হতাশার যন্ত্রণা ভুলিতে বৃথা চেষ্টা করে; যাতনার তুষানলে দগ্ধ হয়; কর্ম্মশক্তি, উৎসাহ, উদ্যম সব হারাইয়া জীবিত কিন্তু জীবন্মৃত হইয়া থাকে। ভালবাসার প্রতিদান না পাইয়া জগতে কত প্রতিভা স্ফূর্ত্ত হইতে পারে না; কত জীবন ব্যর্থ হয়—কত লোক আপনার সর্ব্বনাশ করে তাহার হিসাব কেহ রাখে নাই।

শরৎকুমার সেই হতাশার বেদনা—যাতনা ভোগ করিত। আবার অভিমান-প্রবণ হৃদয় তাহার সেই যাতনা যেন অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইত। সংসারে তাহার স্নেহের যখন আর একটি অবলম্বন হইল—তাহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, তখন তাহার মনে হইল—সে তাহার নিষ্কৃতির উপায় পাইল। সবল মানুষ সে—কখন আপনাকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিত না, কি জানি যদি কখন হতাশার উত্তেজনা তাহাকে পিতার উপদেশ পালনে অসমর্থ করে। তাঁহার শেষ উপদেশ —"যেন কোন দিন চরিত্র কলুষিত করিও না।" তাঁহার উপদেশ যে তাঁহার আদর্শ হইতে অভিন্ন ছিল, তাহা শরৎকুমার জানিত। সে ব্যবসায়ে অত্যধিক মনোযোগ দিয়া প্রতিমার ব্যবহারের বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করিত, পারিত না; এবার সে পুত্রের প্রতি স্নেহে শান্তিলাভের চেষ্টা করিল।

ছেলেটিকে পাইয়া প্রতিমাও যেন একটা কায পাইল, ছেলে "মানুষ করিবার" কায বড় সাধারণ কায নহে। কিন্তু তাহাতে আর একটি ঘটনা ঘটিল। সে স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে যেটুকু আগ্রহ দেখাইত, তাহাও দেখাইতে বিরত হইল। কলের জল যেমন বিশুদ্ধ হইলেও স্বাদহীন, তাহার ব্যবহার তেমনই সর্ব্ববিধ আবিলতা-বর্জ্জিত হইলেও আগ্রহশূন্য ছিল। তাহা যে ভালবাসার উৎস হইতে উদ্গত হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য—কেবল লোকাচার-সঙ্গত ছিল। তাই ছেলের কাযে ব্যস্ত থাকার সুযোগ পাইয়াই তাহার ক্ষীণ স্রোতঃ ক্ষীণতর হইল। শরৎকুমারের সব কাযের ভার সে ত্যাগ করিল। আহারের ভার পাচকের, অন্যান্য কাযের ভার ভৃত্যের হাতে দিয়া প্রতিমা নিশ্চিন্ত হইল। যে দিন প্রথম শরৎকুমার লক্ষ্য করিল, প্রতিমা তাহার আহারের সময় কাছে আসিল না, সে দিন সে প্রায় অভুক্ত অবস্থাতেই উঠিয়া গেল। ভৃত্য যাইয়া সে সংবাদ দিলে প্রতিমা বলিল, "বোধ হয়, ক্ষিদে নেই।" যে দিন প্রথম প্রতিমার পরিবর্ত্তে ভৃত্য তাহার জলখাবারের রেকাবী লইয়া আসিল, সে দিন শরৎকুমার খাইবে না বলিয়া তাহা ফিরাইয়া দিল। প্রতিমা ভাবিল, "সব তা'তেই বাড়াবাড়ি!" সে বিরক্ত হইল এবং ফলে স্বামীর কাযে তাহার শৈথিল্য ক্রমে উপেক্ষায় পরিণতি লাভ করিল।

যত দিন যাইতে লাগিল, প্রতিমার এই ভাব ততই প্রবল ও স্থায়ী হইতে লাগিল।

কোন কোন লোকের প্রকৃতি এইরূপ যে, তাহারা কোন আঘাত পাইলে তাহার ব্যথা ভুলিয়া যাইতে পারে—তাহারা যেন বালস্বভাব; আবার কোন কোন লোক বেদনা পাইলে তাহা ভুলিতে পারে না—চক্ষুতে বালুকণা পতিত হইলে বা চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইলে যেমন যন্ত্রণার কারণ দূর না হইলে যন্ত্রণাও দূর হয় না, তাহাদের মনেও তেমনি বেদনার কারণ দূর না হইলে বেদনা দূর হয় না। শরৎকুমারের তাহাই হইয়াছিল। সে যে পত্নীকে কত ভালবাসিত, তাহা প্রতিমা কল্পনাও করিতে পারিত না। তাহার সবল পুরুষ-হৃদয়ের ভালবাসা যখন উপেক্ষার বাত্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিত, তখন তাহা বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরেরই মত উদ্বেল হইত। স্ত্রীকে পাইবার—তাহাকে বক্ষে ধরিবার—তাহার অধর চুম্বন করিবার জন্য তাহার যে ব্যাকুল বাসনা সে তাহাকেই পীড়িত করিত। তাহার কেবল ভয় হইত—পাছে কোন দিন কোন কারণে সে সংযম হারাইয়া ফেলে, পাছে স্তূপীকৃত বারুদে কোনরূপে অগ্নিকণাপাত হয়।

এইরূপে বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে প্রতিমা একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইল—স্বামীকে হারাইবার শঙ্কা নাই। কাজেই স্বামীর সম্বন্ধে তাহার কোনদিকে কোনরূপ উৎকণ্ঠাও তাহার সুপ্ত প্রেমকে জাগাইয়া তুলিতে পারিল না।

শরৎকুমার মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু ভাল লাগিত না। তাহার মনে হইত, তাহার কায করিবার উৎসাহের কোন কারণ নাই। সে মনে করিত, সংসারে কেহ যাহাকে চাহে না তাহার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র; জীবন যায় না বলিয়াই কেবল যে জীবিত থাকে—সে সংসারের ভার। সে বুঝিত, যে তাহার তিরোভাবে প্রতিমার হৃদয়ে বা জীবনে কোথাও কোন অংশ শূন্য বলিয়া অনুভূত হইবে না। প্রতিমার তাহাকে কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে কি বলিতে পারে—সে প্রতিমাকে চাহে না?—না—না, সে তাহা বলিতে পারে না। তাহার হৃদয়ে প্রতিমার প্রতি ভালবাসার প্রাবল্য যে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই! কেবল কায—পুত্রকে "মানুষ" করা। সেই কাযই তাহার ভাল লাগিত এবং সে তাহাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। পিতাপুত্রের মধ্যে একটা সুমধুর স্নেহভালবাসা ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল। পুত্র পিতাকে ভয় করিত না—ভালবাসিত। পিতাও পরম স্নেহেই তাহাকে "মানুষ করিয়া" তুলিতেছিলেন।

এই ভাবে আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। দীর্ঘ দশ বৎসর—প্রেমহীন, সুখহীন গৃহে দীর্ঘ দশ বৎসর—সে বুঝি দশ যুগেরই মত দীর্ঘ!

এই সময়ের মধ্যে পুত্র বিদ্যার্জন করিয়া পিতার অন্ধকার মনে আনন্দের আলোকপাত করিতে লাগিল। আর শরৎকুমারের মনে হইতে লাগিল, তাহার কায শেষ হইয়া আসিতেছে। সংসারে

সে যদি কোন কায করিয়া থাকে, তবে সে পুত্রকে 'মানুষ" করা—বিদ্যায়, চরিত্রে, বিনয়ে সত্যসত্যই মনুষ্যোচিতগুণে বিভূষিত করা। আরও একটা চিন্তা যে তাহার ছিল না, তাহা নহে। প্রতিমার ব্যবহারে সে বুঝিয়াছিল, তাহাকে প্রতিমার কোন প্রয়োজন নাই; কেবল বুঝিতে পারিত না, কেন এমন হইয়াছে। কিন্তু তবুও প্রতিমার প্রতি তাহার ভালবাসা—সবলের ভালবাসা; সে ভালবাসা, প্রতিমার একটা উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাব হইবে মনে করিলে শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিত। প্রতিমা এক ঘরের এক গৃহিণী—সে সংসারের ব্যবস্থায় যাহা ইচ্ছা করিয়াছে, শরৎকুমার কোন দিন তাহাতে বাধা দেয় নাই—সংসারে তাহার ইচ্ছাই আদেশ বলিয়া সকলকে মনে করিতে হইয়াছে। এ অবস্থায় সংসারের কর্তৃত্ব না পাইলে প্রতিমার নানা অসুবিধা অনিবার্য্য হইবে। এখন শরৎকুমারের আর সে ভাবনার কারণ রহিল না—সনৎকুমার বড় হইয়াছে, তাহার সংসারে তাহার মাতারই কর্তৃত্ব।

এইবার শরৎকুমার ব্যবসায় মন দিল। সমস্ত জীবন সে ব্যবসার প্রতি অমোনোযোগী ছিল, মধ্যে মধ্যে যখন মনোযোগ দিতে যাইত তখনও সে চেষ্টা স্থায়ী হইত না। এইবার সে মনে করিল, ব্যবসাটিকে এমন করিয়া যাইবে যে, তাহা রাখিলেও সনৎকুমারের কিছু অর্থলাভ হইবে, বিক্রয় করিলেও ক্রেতার অভাব হইবে না। প্রথম প্রথম কর্ম্মচারীরা মনে করিল, তাহার এই ভাবান্তরও অন্যান্য বারের ভাবান্তরের মত স্বল্পকালস্থায়ী হইবে, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহারা হতাশ হইতে লাগিল। শরৎকুমার যেন ব্যবসাটির মরা নদীতে বাণ ডাকাইল—আবার নূতন করিয়া উন্নতি আরম্ভ হইল—কর্ম্মচারীদিগের চুরি বন্ধ হইল। ব্যবসায়ের উন্নতি-চেষ্টাটাই যেন শরৎকুমারের নেশা হইয়া দাঁড়াইল। সে অন্য শ্রমকে সে শ্রম বলিয়া মনে করিত না; পরন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সে শ্রমের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল—যাহা কখন করে নাই, তাহাই করিতে লাগিল—বেলা ১০টা না বাজিতেই আফিসে যাইয়া সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত আফিসের কাযে ব্যস্ত থাকিতে লাগিল। ব্যবসার উন্নতি হইতে লাগিল বটে কিন্তু অতিশ্রমে অনভ্যস্ত শরৎকুমারের স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দারুণ শিরঃপীড়া, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি তাহাকে জানাইয়া গেল—সাবধান! সাবধান হওয়া ত দূরের কথা, সে এই স্বাস্থ্যহানিতে যেন আনন্দলাভ করিল। তাহার স্বাস্থ্য যে কখন নষ্ট হইতে পারে, ইহা সে কল্পনাই করিতে পারিত না; এখন—বন্দী তাহার কারাকক্ষের বাতায়নপথ মুক্ত দেখিলে যেমন আনন্দিত হয়, সে তেমনই আনন্দানুভব করিল—এই পথেই সে মুক্তি পাইতে পারিবে। জীবন যখন যাতনা মাত্র—মৃত্যুই তখন মুক্তি।

এই সময় একটি অতর্কিত ঘটনায় শরৎকুমার প্রতিমার ব্যবহারের রহস্য ভেদ করিতে পারিল।

সে দিন প্রতিমার এক পিসীমা তাঁহার এক ননদের নাতিনীর সঙ্গে সনৎকুমারের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে আসিয়াছিল, প্রতিমার বাপের বাড়ীর পুরাতন ঝি।

ছেলের বিবাহের কথা যে ইতঃপূর্ব্বেই প্রতিমার মনে হয় নাই, এমন নহে; কিন্তু অনেক ভাবিয়া সে, সে কথার উত্থাপন করে নাই—প্রথম, এইত সংসারের "ছিরি," ইহার মধ্যে বৌ আনা! দ্বিতীয় কথাটা তুলিলে অনেক আলোচনা করা অবশ্যম্ভাবী হইবে; স্বামিস্ত্রীতে যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে সেরূপ আলোচনা করিতে তাহার আগ্রহ ত ছিলই না—ইচ্ছারও ষোল আনা অভাব অনুভূত হইয়াছিল। তৃতীয়, শরৎকুমার বলিবেন, "ভাল—ইচ্ছে হয় বিয়ে দাও"—কিন্তু বিবাহ ত মুখের কথায় হয় না, "কে করে কর্ম্মায়?" চতুর্থ, তাহার ঐ এক সন্তান—সে ঘটা করিবে; নহিলে লোক কি মনে করিবে? কিন্তু সে সব হইবে কি না, কে জানে?

আজ পিসীমা আসিয়া সেই কথা তুলিলেন; বলিলেন, "তোর যে কি ভাব, তা' বুঝতে পারিনে—এতবড় ছেলে হল; দশটা নয় পাঁচটা নয়—একটা ছেলে, তাও তুই বিয়ের কথা কস্ না! আমার ননদের নাতিনী মেয়েটি দিব্য দেখতে—তোর উপযুক্ত বৌ হ'বে—দেবে থোবেও ভাল দশ পনের হাজার ত নিয়েই বসে আছে, তা'র পর বাপেরও ঐ এক মেয়ে, ছেলে নেই।"

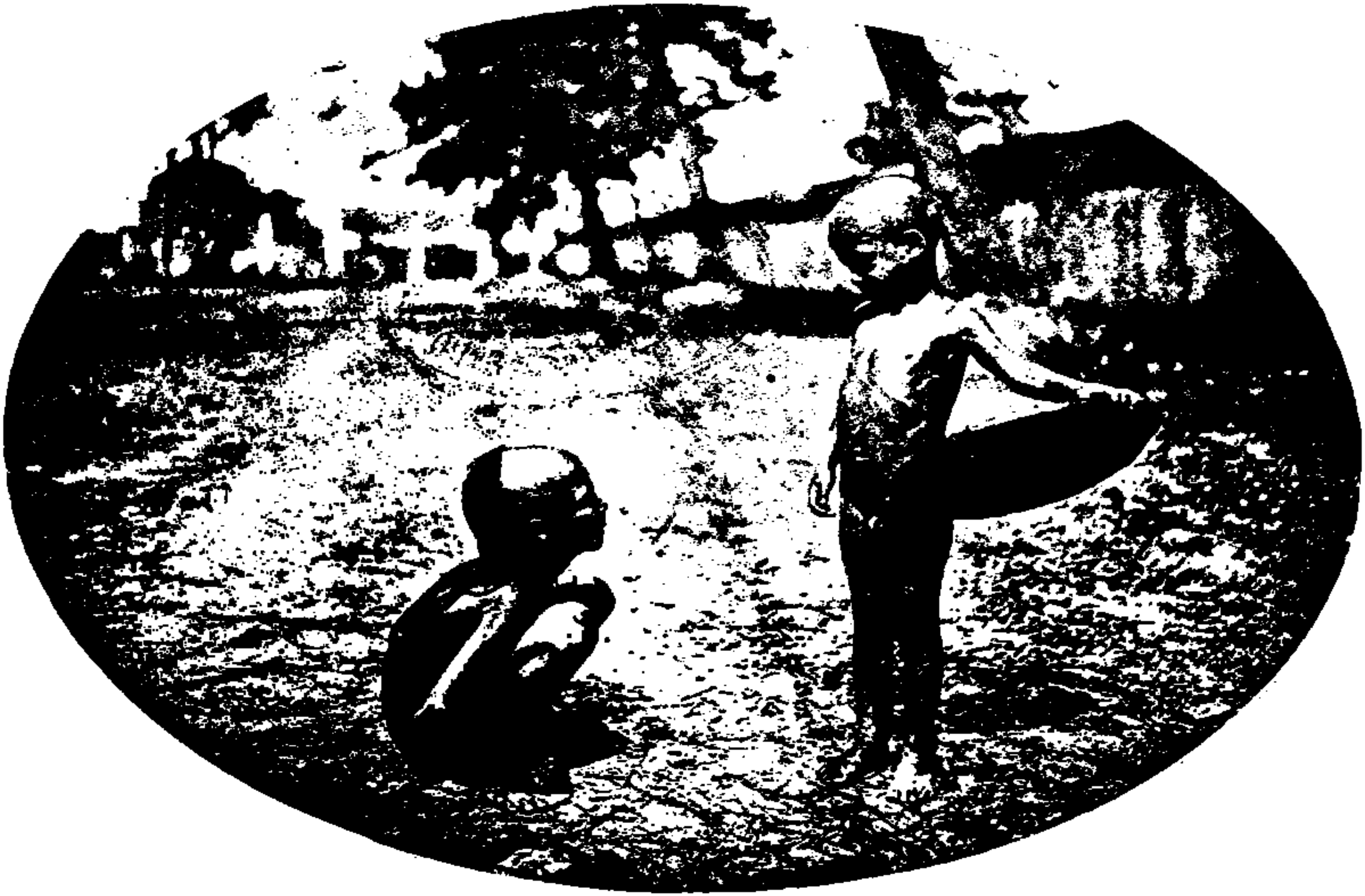
পিসীমা খুব "গল্পে" লোক—বিশেষ কিছুকাল হইতে অজীর্ণের ঔষধরূপে অহিফেন সেবন আরম্ভ করায় গল্পের অভ্যাসটাও যেমন বাড়িয়াছে, অতিরঞ্জনটাও তেমনই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি প্রবল বেগে ননদের নাতিনীর সঙ্গে সনৎকুমারের বিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিতেছিলেন। তাঁহারা বারান্দায় বসিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। বারান্দার পরেই শয়ন-কক্ষ। সেদিন আফিসে শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া শরৎকুমার চলিয়া আসিয়াছিল—শুইয়া ছিল। বহুদিন হইতেই স্বামিস্ত্রীতে সম্বন্ধ এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, প্রতিমা স্বামীর সামান্য অসুখে বা অসুবিধায় মনোযোগ দিত না; শরৎকুমারও তাহার আশা করিতে পারিত না। শয্যায় শয়ন করিয়া শরৎকুমার বারান্দার কথোপকথন শুনিতে পাইতেছিল।

পার্শ্বের বাড়ীর প্রাঙ্গণে কয়টি বালক বালিকা খেলা করিতেছিল। প্রতিমা তাহাদিগের খেলা দেখিতেছিল। পিসীমা বলিলেন, "তোর সঙ্গে কথা বলে যদি এতটুকু সুখ হয়! কেবল 'হাঁ'—আর 'না' বলছিস্! কি দেখছিস্?"

প্রতিমা বলিল, "দেখ না, পিসীমা, কেমন ফুটফুটে ছেলেমেয়ে ক'টি! আমার দেখতে বড্ড ভাল লাগে।"

ঝি বলিল, "দিদিমণি সোন্দর বড় ভালবসে—মা'র একি পেয়েছে, পিসীমা।"

পিসীমা বলিলেন, "তা' আর আমি জানিনে? বিয়ের সময় কি কাণ্ড! জামাই কালো শুনে বৌ ত শয্যা নিলে; আমরা সবাই বলি, 'দাদা রাগ করবেন'—'শুভক্ষণে নিশ্বেস ফেল্‌তে নেই'—



খেলাধূলা।

'পুরুষমানুষের রূপের কি দরকার ?'—তা' কি বৌ বোঝে। কেঁদেকেটে অনর্থ করতে লাগল। শেষে আর কি করবে বল—'বলে, বেঁধে মারে, সয় ভাল।' কিন্তু সেই জন্যে বড় জামাইয়ের উপর কখনও তেমন টান হয় নি।"

প্রতিমার মনে হইতে লাগিল, এতদিন পরে পিসীমা আর সে সব কথা না তুলিলেই ভাল হইত—বিশেষ, শরৎকুমার হয়ত শুনিতে পাইতেছে।

বাস্তবিক শরৎকুমার কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছিল। শুনিয়া বিবাহের দিনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল; সে দিন সে যে কথায় মনোযোগ দেয় নাই, এত দিন পরে তাহার গুরুত্ব সে উপলব্ধি করিতে পারিল। জীবনের ব্যর্থতার অনুভূতি-যাতনা—শারীরিক যাতনাকে অভিভূত করিয়া দিল।

ঝি কম গেল না। সে বলিল, "সে কি কাণ্ড! জামাই দেখেই বা মা'র কত কান্না! তাই ত আর সব দিদিমণির বিয়েতে বাবাও আর কোন কথা বলেন নি—মা'র মতে সোন্দর জামাই হয়েছে—আর লেখাপড়া না দেখে কেবল কুটুম্ব দেখা হয়েছে। দিদিমণির একটি বই ছেলে হ'ল না, তা-ও তেমন সোন্দর হ'ল না।"

পিসীমা বলিলেন, "সোন্দর হয়নি তা' কি হয়েছে? অমন ছেলে হাজারে একটি মেলে না—যেন হীরের টুকরো। বেঁচে থাক। প্রতিমা বৌ ঘরে আসুক—ঘর-আলো-করা বৌ হ'বে। ছেলে বৌ নিয়ে হাতের নোয়া নিয়ে সুখে থাকুক।"

তাহার পর পিসীমা আবার সনতের বিবাহের কথা পাড়িলে প্রতিমা বলিল, "তা,' পিসীমা, তুমিই একবার বলে দেখ না কেন?"

পিসীমা বলিলেন, "আমার কি বাছা, আর থাকবার উপায় আছে? গিয়ে তবে ঠাকুরের 'শয়ন' থেকে উঠাবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। জামাই ফিরতেও দেরী হবে!"

"না—ঐ ঘরেই"—

পিসীমার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি সহসা করস্পর্শে লজ্জাবতী লতার পত্রের মত সঙ্কুচিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ওমা! তা' তুই আমাকে বলিস নি! জামাই গলা শুনলে—সব শুনলে। কি লজ্জা! মা—কি লজ্জা!"

পিসীমাকে লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিমা বলিল, "তা'তে আর কি হয়েছে, পিসীমা?"

পিসীমার উপর প্রতিমার সত্যই ভালবাসা ছিল। তিনি "গল্পে"—স্বার্থপর—এ সব সত্য হইলেও ভাইঝিদের উপর তাঁহার স্নেহ যেমন মুখর, তেমনই কারণে—অকারণে অতিরঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিত।

৬

পিসীমা যখন শরৎকুমারের ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন সে শয্যায় শয়ন করিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছিল। সে কষ্টে উঠিয়া পিসীমা'কে প্রণাম করিল।

পিসীমা বলিলেন, "কি, বাবা, অসুখ করেছে ?"

শরৎকুমার বলিল, "মাথার অসুখ, এ আমার মধ্যে মধ্যে হয়।"

"তা' ডাক্তার কবরেজ দেখাও না কেন ?"

শরৎকুমার কোন কথা বলিল না।

পিসীমা বলিলেন, "ওকি কথা, বাবা, কালই দেখিও। আমি এসেছিলাম, সনতের বিয়ের কথা বলতে—ছেলে বড় হয়েছে, প্রতিমার ঐ এক ছেলে; এইবার বৌ ঘরে আন। তা' আমি আর এক দিন আসব।"

শরীরের যন্ত্রণা ও মনের যন্ত্রণা শরৎকুমারকে আর মনের ভাব গোপন করিতে দিল না; সে বলিল, "আমি ত ছেলের বিয়ে দেব না।"

"সে কি কথা, বাবা! ও কথা বলো না"—বলিয়া পিসীমা বলিলেন, "আজ আমি আসি।"

প্রতিমা তাঁহার সঙ্গে গাড়ী পর্য্যন্ত গেল। পিসীমা বলিলেন, "যা' না মা, জামাইয়ের কাছে বসগে—অসুখ করেছে যে!"

প্রতিমা বলিল, "ও অসুখ বারমেসে।"

"হ'লই বা বারমেসে; তাই বলে শুশ্রূষা করবি নে! যা'—তুই যা'।"

একে ত বহুদিন স্বামিস্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধ যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে শরৎকুমার রোগে শুশ্রূষা পাইত না, তাহার উপর আজ পিসীমা'র সঙ্গে স্বামীর কথায় প্রতিমা আরও চটিয়া গিয়াছিল—অমন করিয়া কি গুরুজনের সঙ্গে কথা কহিতে হয়, ও ত ইচ্ছা করিয়া অপমান করা! সে যাইয়া আপনার ঘরে বসিল—তাহার পর কাপড় কাচিতে চলিয়া গেল।

অন্যদিন এরূপ অবস্থায় শরৎকুমার ভৃত্যকে ডাকিয়া জল গরম করাইয়া "ফুটবাথ" লয়; আজ সে তাহাও করিল না; আপনার জন্য তাহার আর কোন কায করিবার প্রবৃত্তি ছিল না।

সন্ধ্যার পর ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার দেওয়া হ'বে কি ?"

শরৎকুমার বলিল, "না।"

প্রতিমা তাহা শুনিয়া পাচককে বলিল, "বাবুর খাবার দিতে হ'বে না।" এই পর্য্যন্ত।

বার দুই বমির পর রাত্রি দশটার পর শরৎকুমার ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার বমির শব্দ পাইয়াই সনৎকুমার তাহার কাছে আসিয়া বসিয়াছিল—সে পুনঃ পুনঃ তাহাকে যাইয়া ঘুমাইতে বলিবার পর সে উঠিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ রাত্রিতে যখন শরৎকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে অনুভব করিল, কেহ তাহার শিয়রে বসিয়া অতি ধীরে কেশমধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিয়া তাহার রোগযন্ত্রণার প্রশমনচেষ্টা করিতেছে; সে চাহিয়া দেখিল—পুত্র।

পুত্রের এই স্নেহপরিচয়ে শরৎকুমারের বুকের মধ্যে চাঞ্চল্য অনুভূত হইল—তাঁহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। যাহার পক্ষে যেটি যত দুর্লভ তাহার পক্ষে সেটির লাভ তত বিস্ময়কর—যে হ্রদে ঝড়ের বেগ সাধারণতঃ অনুভূত হয় না—তাহার বুকে ঝড়ে প্রবল তরঙ্গ উঠে।

চাঞ্চল্যের আতিশয্যে সে কোন কথা বলিতে পারিল না; কেবল মনে মনে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিল—পিতার দুর্ভাগ্য যেন তোমাকে আক্রমণ না করে।

পরদিন পিসীমা'র ঝি আবার সনতের বিবাহের কথা লইয়া আসিলে প্রতিমা শরৎকুমারকে শুনাইয়া বলিল, "পিসীমা'র যেমন লজ্জা নেই—নইলে কাল মা' শুনে গেছেন, তা'র পর আবার ও কথা জানতে পাঠান!"

৭

সেই দিন হইতে শরৎকুমারের মনে নূতন আশঙ্কার উদয় হইল—পাছে পুত্রের প্রতি স্নেহবশে সে সঙ্কল্পচ্যুত হয়। সে মনে করিয়াছিল—তিলে তিলে দেহপাত করিবে। অতিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছিল অনুভব করিয়া তাই সে আনন্দিত হইতেছিল।

এই সময় সনৎকুমারও বলিল, "বাবা, আপনার শরীরটা খারাপ হয়েছে, একটু ঘুরে আসুন না কেন?"

পূর্ব্বে শরৎকুমার প্রতি বৎসর একবার সপরিবারে বেড়াইতে যাইত; কিন্তু কয় বৎসর আর তাহা হয় নাই।

শরৎকুমার বলিল, "কায ছেড়ে যাওয়া ঘটে উঠে না।"

সনৎকুমার বলিল, "কায আমি দেখব।"

পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পিতা পুরীযাত্রা করিল—শরৎকুমার মনে করিল, এই তাহার সুবিধা। তথায় যাইয়া সে দেহপাতের আয়োজন পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল—আহার প্রায় ত্যাগ করিল! সে বাছিয়া যে গৃহ ভাড়া লইল তাহাতে তাহার পূর্ব্বে এক যক্ষ্মারোগী ছিল।

এক মাস কাটিয়া গেল—শরৎকুমার পুত্রকে লিখিল, সে ভাল আছে। কিন্তু তখন সে শয্যা লইয়াছে। শেষে তাঁহার পত্রে তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিয়া পুত্রের সন্দেহ হইল—হাত না কাঁপিলে অক্ষর তেমন হয় না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সনৎকুমার পুরী যাত্রা করিল।

৮

পুরীতে পৌছিয়া সনৎকুমার যাহা দেখিল, তাহাতে সে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না—পিতার সেই সবল দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কঙ্কালসার হইয়াছে—পাণ্ডুবর্ণ মুখে মৃত্যুর ছায়া লক্ষ্য করিতে বিলম্ব হয় না।

পুত্রকে কান্দিতে দেখিয়া পিতা বলিলেন, "কান্না কেন, বাবা। বাপ কি কারও চিরস্থায়ী হয়? তুমি বড় হয়েছ; আমার কায শেষ হয়েছে; এখন আমি সুখে মরছি; এ যে আমার মুক্তি!"

পুত্র তাহা জানিত—পিতার বুকের বেদনা সে অনুমান করিতে পারিত, কিন্তু আজ এই কথায়—পিতার আত্মহত্যার চেষ্টায় তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিল। অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। পুত্রের ভাব দেখিয়া পিতাও অবিচলিত থাকিতে পারিলেন না। সেই চাঞ্চল্যে শরৎকুমারের দেহ যেন অবসন্ন হইয়া আসিল, শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। তিনি অবসন্ন ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন; দেখিয়া সনৎকুমার ব্যস্ত হইয়া আসিল পিতার পার্শ্বে বসিল।

একটু সামলাইয়াই শরৎকুমার বাড়ীটি বদলাইতে ব্যস্ত হইলেন। তখন সনৎকুমার জানিতে পারিল, পিতা ইচ্ছা করিয়া যক্ষ্মারোগীর অধিকৃত গৃহে আসিয়াছিলেন। কত বেদনা পাইলে সুস্থ—সবল পুরুষ এমনভাবে আত্মনাশ করিতে পারে এবং সেই বেদনা সহ্য করিয়াও তিনি দীর্ঘকাল কিরূপে হাসির আবরণে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছেন—কোন দিন তাহার মাতার প্রতি বিন্দুমাত্র অযত্ন বা অবহেলা প্রকাশ করেন নাই—তাহা মনে করিয়া সনৎকুমারের হৃদয় পিতার জন্য বেদনায় যেমন কাতর হইল—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় তেমনই পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সেই দিনই সনৎকুমার বাড়ী বদলাইয়া পিতাকে তথায় লইয়া গেল এবং পিতার কথা না মানিয়া ডাক্তার আনাইয়া পিতাকে দেখাইল। ডাক্তার কোনও আশা দিতে পারিলেন না; বলিলেন—"শরীরে আর কিছুই নাই; এমন অবস্থায় মানুষ কেমন করিয়া বাঁচিতে পারে, বলিতে পারি না।"

শরৎকুমারের মনে হইল মৃত্যুর কূলে তিনি জীবনমরুমধ্যে স্নেহের স্নিগ্ধ ধারার সন্ধান পাইয়াছেন; তাহা আকণ্ঠ পান করিলেও বুঝি তৃষ্ণা মিটে না!

সনৎকুমার মা'কে পৌঁছান-সংবাদ দিয়াছে কিনা, শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিল; সে সংবাদ দেয় নাই জানিয়া বলিল, "পত্র লিখে দাও—তিনি ভাববেন।"

পত্র লিখিয়া তাহা পাঠাইয়া দিয়া সনৎকুমার আবার পিতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলে শরৎকুমার বলিল, "তোমার মা'কে কখন অযত্ন বা অবহেলা ক'রো না; তা'তে তাঁ'র বড় কষ্ট হ'বে। তোমা হ'তে তিনি যেন সুখী হ'তে পারেন।"

সনৎকুমার বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

পরদিন সনৎকুমার অফিসে টেলিগ্রাফ করিল—"তহবিলের টাকা পাঠাইয়া দাও।" কর্ম্মচারীরা আদেশ অনুসারে কায করিবার পূর্ব্বে প্রতিমার কাছে ঘটনা জানাইল; টাকাটা না পাঠাইবার পক্ষে যত যুক্তি থাকিতে পারে বলিল। প্রতিমা বলিল, "তবে তাই লিখে দিন।" সে কোনরূপ ব্যস্ততা দেখাইল না।

তৃতীয় দিন কর্ম্মচারীরা যখন আর একখানা টেলিগ্রাফ লইয়া আসিয়া জানাইল, সনৎকুমার

টেলিগ্রাফ করিয়াছে, বাবুর অবস্থা শঙ্কাজনক টাকা পাঠাইতে বিলম্ব না হয়; কিন্তু শনিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া গিয়াছে—টাকা বাহির করিবার উপায় নাই—বাহিরের তহবিলে আছে কেবল তিন শত টাকা, তখন প্রতিমা বলিল, পূর্ব্বের সংবাদ পাইয়া টাকা বাহির করিয়া রাখা হয় নাই কেন ?

প্রধান কর্ম্মচারী উত্তর দিলেন, সে-ই বলিয়াছিল—পত্র লিখিয়া দেওয়া হউক।

প্রতিমা নিরুত্তর হইল। সে বুঝিল, দোষ তাহার।

কর্ম্মচারী বলিয়া গেলেন, তিনি তিন শত টাকাই পাঠাইয়া দিবেন।

সেই সময় ভৃত্য একখানি পত্র লইয়া আসিল।

৯

পত্রখানি শরৎকুমারের লিখিত। এতদিন পরে স্বামীর পত্র! প্রতিমা খাম খুলিয়া পড়িল লেখকের হাত কাঁপিয়াছে, অক্ষরে তাহার পরিচয়। পত্রে শরৎকুমার লিখিয়াছে :—

"আমার প্রতি তুমি বিরূপ কেন তাহার কারণ সন্ধান করিয়া বহুকাল পাই নাই; তাহার পর সে দিন তোমার পিসীমা'র সঙ্গে তোমার কথায় জানিতে পারিয়াছি। তোমার রুচি, তোমার মন, তোমাকে আমার উপর বিদ্রোহী করিয়াছিল—তোমার দোষ ছিল না। সেই অবস্থায় আমাকে লইয়া এই এতদিন, তুমি কত কষ্ট নীরবে ভোগ করিয়াছ, মনে করিয়া আমার মনে তোমার বেদনা অনুভব করিয়াছি। আমি তোমার সকল দুঃখের—তোমার জীবনের ব্যর্থতার কারণ। যদি পার আমাকে ক্ষমা করিও; আমিও জানিয়া অপরাধ করি নাই। যিনি মাতৃহারা কালো ছেলেকে পিতামাতার স্নেহে পালন করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে ডাকিয়াছেন। কাল-সাগরের তরঙ্গের উপর হইতে তাঁহার আহ্বান শুনিতে পাইয়াছি। আমি চলিলাম, আমি সনতের বিবাহ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম—পাছে আমার দুর্ভাগ্য তাহাকেও আক্রমণ করে। আমার সে সাহস নাই। আমি আপনাকে এ সংসার হইতে সরাইয়া চলিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, এ জন্মে যে সুখশান্তি পাও নাই, জন্মান্তরে তাহা লাভ করিও।"

সনৎকুমার পিতাকে দেখিতে পুরীতে গিয়াছে সংবাদ পাইয়া প্রতিমার মাতা সংবাদ লইতে আসিলেন। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তুই এখনও যাস নি! বলিস কি!"

মা'র কথায় প্রতিমা যেন চমকিয়া উঠিল। যাইয়া সে কি করিবে? তবুও তাহার মা'র মত, যাওয়াই তাহার কর্ত্তব্য! এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভাব তাহার মনে দেখা দিল—সে শঙ্কা। স্বামীকে সে যে হারাইতে পারে, এ আশঙ্কা সে পূর্ব্বে কখন করে নাই। যাহাকে হারাইবার ভয় থাকে, তাহার প্রতি আকর্ষণও একটু প্রবল হয়। যে মা'র জামাতার প্রতি স্নেহের অল্পতার কথা সে দিনও পিসীমা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া প্রতিমা একটু বিস্মিত হইল—জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আমি যা'ব ?"

মা বলিলেন, "তোর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেল? যাবি না ত কি এই খবর পেয়ে বসে থাক্‌বি?

প্রতিমা সরকারকে ডাকিতে পাঠাইল। মা বলিলেন, "আমি তোর মেজদা'কে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সে-ই তোকে নিয়ে যাবে। সেখানে ত সনৎ একা ছেলে মানুষ।"

তাহার পর কিছুক্ষণ মাও কোন কথা বলিলেন না, মেয়েও কিছু বলিল না—উভয়েই ভাবিতে লাগিলেন। মা-ই প্রথম কথা বলিলেন, "তবে আমি বাড়ী যাই, তুই তৈরী হয়ে নে। কি যে আছে কপালে! আর ভাবতে পারি নে।"

মা চলিয়া গেলেও প্রতিমা তেমনই ভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

রাত্রিতে সে দাদার সঙ্গে পুরী যাত্রা করিল।

১৭

প্রতিমা যখন গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর বারান্দায় উঠিল তখন ডাক্তার চলিয়া যাইতেছেন। তিনি সনৎকুমারকে বলিয়া গেলেন, "আপনি ত বুঝতেই পারছেন—শরীরে কিছু নেই, কেমন করে যে বেঁচে আছেন সে-ই আশ্চর্য্য।"

সনৎকুমার দেখিল—সম্মুখে মা। তাহার মেজমামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার কি বলে গেলেন, সন্থ?"

সনৎকুমার নিষ্ঠুর সত্যটি নিঃসঙ্কোচে বলিয়া দিল, "বল্‌বার আর কিছু নেই; বাবা আত্ম-হত্যা করেছেন—তবে দিনে দিনে—তিলে তিলে।"

প্রতিমার মনে হইল, তাহার বুকে যেন কেমন একটা আঘাত লাগিল। সে পুত্রের অনুসরণ করিয়া শরৎকুমারের কক্ষে প্রবেশ করিল।

রোগীর তখন শ্বাসকষ্ট অনুভূত হইতেছে। সম্মুখে প্রতিমাকে দেখিয়া সে যেন চমকিয়া উঠিল—দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল—তাহার পর শিবনেত্র রোগীর কণ্ঠে দুইবার মৃদু ঘর্ঘর শব্দ শুনা গেল। সনৎকুমার আবেগকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—"বাবা! বাবা!"

রোগীর কর্ণে সে শব্দ প্রবেশ করিল। শরৎকুমার অন্তিম চেষ্টায় একবার পুত্রের দিকে চাহিতে গেলেন—পারিলেন না। সব শেষ হইয়া গেল।

সনৎকুমার পিতার শবের উপর পড়িয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

প্রতিমা প্রস্তর পুত্তলীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতিমার ভ্রাতা সৎকারের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন।

১৮

মা'কে লইয়া সনৎকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। প্রতিমার মা, পিসীমা প্রভৃতি আসিয়া

তাহার দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন—যে জামাতাকে জীবনে তাঁহারা স্নেহ দিতে পারেন নাই, তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিলেন না।

প্রতিমা পরিচিত সংসারে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই গৃহে একটা বিরাট শূন্যভাব অনুভব করিল। যাঁহাকে সে হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়াছিল, তিনি একা গৃহে কতটা স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা সে তাঁহাকে হারাইয়া বুঝিতে লাগিল। বাড়ীটা যেন "পড়ো বাড়ী"! সে বাড়ীতে বাস করাই যেন দুঃসাধ্য! মা, পিসীমা প্রভৃতি যখন সন্ধ্যার পরেই চলিয়া যাইতেন—পুত্র পিতার শূন্য কক্ষের নগ্ন মেঝের উপর কম্বল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইত—তখন তাহার মনে হইত, কি বিরাট শূন্যতা! তাহার মা ও পিসীমা প্রভৃতি তাহাকে পুত্রের কাছে শয়ন করিতে উপদেশ দিয়া যাইতেন; কিন্তু সে শত চেষ্টা করিয়াও সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারিত না—সে ঘরে সে বহুকাল প্রবেশ করে নাই—কতকাল! পুত্র পিতার কক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল।

নিশীথে একা বিনিদ্র অবস্থায় তাহার মনে হইত—দীর্ঘ দিনের শত স্মৃতি যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিবাহিত জীবনের কত কথা বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া দেখা দিত। স্বামীর যে আদর, যে যত্ন, সে ঘৃণায় উপেক্ষা করিয়াছে—তাহার জন্য তাঁহার সে ব্যাকুলতা সে উপহাস করিয়াছে—সে সকল কি সত্যই উপেক্ষার ও উপহাসের ছিল? তিনি ত কোন দিন আঘাতের প্রতিঘাত দেন নাই! তাহার সঙ্গ লাভের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা—সে কি ভালবাসারই পরিচায়ক নহে? জীবনে সে যাঁহাকে ঘৃণা ব্যতীত ভালবাসা দেয় নাই, তাঁহারই অভাবে তাহাকে লৌকিক আচারে বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কেবলই সন্দেহ জাগিতে লাগিল—সে ভুল করে নাই ত?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সন্দেহে সে যেন লজ্জানুভব করিত—আপনার কাছে আপনি সঙ্কোচ অনুভব করিত। মনে যাহাই হউক, সনৎকুমার পিতার শেষ আদেশ দৃঢ়ভাবে পালন করিতেছিল—"তোমার মা'কে কখন অযত্ন বা অবহেলা করো না। তোমা হ'তে তিনি যেন সুখী হ'ন।" তবুও প্রতিমার মনে হইত—তাহার পুত্র, সংসারে তাহার একমাত্র অবলম্বন—তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব—সে তাহার পিতার কাছে কোন কথা শুনে নাই ত, মা'কে সে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে পারিবে ত? সে যখন সে কথা মনে করিত, তখনই তাহার বুকের মধ্যে বিষম বেদনা অনুভূত হইত—তাহার নিবারণচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিত।

এইভাবে অশৌচের সময় কাটিয়া গেল।

শ্রাদ্ধের কায শেষ হইলেই সনৎকুমার ব্যবসায়ে এত মনোযোগ দিল যে, বাড়ীতে তাহার কেবল আহারের ও নিদ্রার সময় ব্যতীত অন্য সময় অতিবাহিত হইত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দূরদর্শী পিতা মৃত্যুকালে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "আমি যে সব পণ্য 'ধরিয়া' রাখিয়াছি—যুদ্ধের জন্য সে সকলের মূল্য বাড়িবে।" হইলও তাহাই। বরং লোহার জিনিস যেন অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিল; কাযেই ব্যবসায়ে সনৎকুমারের কল্পনাতীত লাভ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সে

ব্যবসা বাড়াইতে লাগিল। তাহার প্রকৃত কারণ কিন্তু সে ব্যতীত কেহই জানিতে পারিল না। সে কেবল কাযের মধ্যে ডুবিয়া—মনের বেদনা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিত; তরুণ যুবকের মনের মধ্যে সংসারী হইবার যে বাসনা বলবতী হয়, তাহা দলিত করিতে চাহিত। ধন সে উপার্জ্জন করিত, কিন্তু কেবল দান করিত—পিতার নাম স্মরণীয় করিতে চেষ্টা করিত।

প্রতিমা যে তাহার সংসারের ও জীবনের একমাত্র অবলম্বন পুত্রকেও পাইত না তাহাতে তাহার হৃদয়ের শূন্যভাব যেন তাহার কাছে প্রবল হইয়া প্রতিভাত হইত। দীর্ঘ অবসর—সেই অবসরে তাহার এক একবার পূর্ব্বকথা মনে পড়িত; শরৎকুমারের সমস্ত ব্যবহারের আলোচনা করিয়া সে উগ্রতা, অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের কোন পরিচয় পাইত না। তবে কি সে ভুল করিয়াছিল?

প্রতিমার মা, পিসীমা প্রভৃতি সর্ব্বদাই তাহাকে বলিতেন, "ছেলের বিয়ে দে। ঘরে বৌ আন। নইলে থাকবি কেমন করে? বাড়ী যেন খাঁ খাঁ করছে। আর ছেলেও কেবলই কায কায করে বাইরে থাকে—ওকি ভাল? বছরটা কাটলেই ছেলের বিয়ে দে।"

প্রতিমা ভাবিত, লোক এমন কথা বলে কেন? স্বামীর মৃত্যুতে তাহার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে? যিনি নিকটে থাকিয়াও দূরস্থ ছিলেন—তাঁহাকে হারাইয়া সে কি এত হারাইয়াছে? তবুও যেন মনে হইত—সত্যসত্যই বাড়ী শূন্য! আর হৃদয়?—

১২

শরৎকুমারের বার্ষিক শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে প্রতিমা পুত্রকে বলিল, "সনৎ, এইবার আমি তোমার বিয়ে দেব।"

সনৎকুমার যেন চমকিয়া উঠিল—দেহে সহসা কোন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বিদ্ধ হইলে লোক যেমন চমকিয়া উঠে তেমনই চমকিয়া উঠিল; তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। সে একটু কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, মা।"

তাহার কথায় এমন একটা দৃঢ় ও দুর্জ্জেয় ভাব ছিল যে, প্রতিমা আর কোন কথা বলিতে পারিল না। সে ভাব সব যুক্তির পথ বন্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু সনৎকুমারের দিদিমা তত অল্পে নিরাশ হইলেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে নাতীকে বিবাহের কথা বলিতে লাগিতেন। সনৎকুমার সে কথা হাসিয়া—বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিত, "পাশ কাটাইয়া যাইত।"

শেষে এক দিন প্রতিমার মা, পিসীমা প্রভৃতি দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আসিলেন, "ছেলের আবার মত! মুখে অমন কথা সবাই বলে।"—তাঁহারা তাহার কথা শুনিবেন না। পিসীমা তাঁহার ননদের নাতিনীকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন—"ডাগর মেয়ে—চাঁদপানা দেখ্‌তে, দেখ্‌লেই ছেলের বিয়েয় মত হবে।"

সনৎকুমার এই ষড়যন্ত্রের বিষয় বিন্দুমাত্র অবগত ছিল না। রবিবারেও সে একবার অফিসে

সপ্তাহের কাযের ছকটা একা বসিয়া ভাবিয়া স্থির করিয়া লইত, তবে অপরাহ্ণেই অফিস হইতে চলিয়া আসিত। সে দিন অপরাহ্ণে সে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, দিদিমা প্রভৃতি উপস্থিত। সে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল—দিদিমাদের মুখে দুষ্ট হাসি লক্ষ্য করিল না।

সে যাইয়া হাতমুখ ধুইয়া আপনার ঘরে বসিল। দিদিমা তাহার জলখাবারের রেকাবী হাতে লইয়া সেই ঘরে গেলেন—সঙ্গে প্রতিমা। আর তাঁহাদের পশ্চাতে প্রতিমার পিসীমা। তিনি তাঁহার ননদের নাতিনীকে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সনৎকুমার বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেই একগাল হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ ত, দাদা, কেমন মেয়ে?"

সনৎকুমার বলিল, "দিব্য ত মেয়েটি।"

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, "আমার ননদের নাতিনী—তোর কনে।"

মেয়েটির মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু সনৎকুমারের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

দিদিমা বলিলেন, "আর অমত করো না। মা'র ত তুমি ছাড়া কেউ নেই; মা কি নিয়ে থাকবে?"

বলিয়া দিদিমা কন্যার বৈধব্যের কথা স্মরণ করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সনৎকুমার যেন আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না; বলিল, "না, দিদিমা! সে হ'বে না। যে ভুল আপনি করেছেন, সে ভুল যেন আর কেউ না করে, কালো ছেলেকে জামাই না করে। কালো ছেলেদের বিয়ের কায নেই।"

দিদিমা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার নিজের ত্রুটির পরিণাম উপলব্ধি করিয়া নির্ব্বাক হইলেন।

প্রতিমার মনে হইল স্বামীর প্রতি তাহার উপেক্ষা, অবহেলা, ঘৃণা আজ তাহার পুত্রের কথায় তীক্ষ্ণ শরের মত তাহার বুকে বিদ্ধ হইল। সে কেমন করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

আর কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না—যেন উৎসবানন্দের মধ্যে সহসা মৃত্যুর মূর্ত্তি দেখা গেল। প্রতিমার মনে হইল—সত্যই আজ তাহার সব শেষ হইয়া গেল।

বলি বিভ্রম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

১

বঙ্গের নগর পল্লী নদ নদী প্রান্তর আকাশে বাতাসে এক নবীন আনন্দের হিল্লোলে জাগিয়া উঠিয়া মা আনন্দময়ীর আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। বাঙ্গালী তাহার বর্ষব্যাপী দুঃখ দৈন্য ভুলিয়া অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য সেই বিশ্বব্যাপী আনন্দ হিল্লোলে সাড়া দিতেছে। ভবানীপুরের তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতেও এই শারদীয়া মহোৎসব হইতেছে, কিন্তু ভাগ্যদোষে তারাকান্ত বাবু আজ বিষাদ মগ্ন।

তারাকান্ত বাবুর কিঞ্চিৎ জমিদারী আছে; নিজেও উপযুক্তরূপে লেখাপড়া শিখিয়া ছিলেন। তাঁহার বড় ছেলে রেবতী যখন বি-এ পাশ করিল, তখন হাকিমী বা অন্য একটা ভাল চাকুরিতে ঢোকাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র"—অবশেষে তাহাকে তারাকান্ত বাবুর নিতান্ত অনিচ্ছায়, পুলিসের দারগাগিরি কার্য্য গ্রহণ করিতে হয়। আজ পাঁচ বৎসর সে পুলিসেই কাজ করিতেছে, অর্থও যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু তারাকান্ত বাবুর তাহাতে মনের শান্তি নাই। এই পূজাতে রেবতীর বাড়ী আসিবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার থানার মধ্যে একটা হাঙ্গামা হওয়ায়, আসামী থাকায়, সে আসিতে পারে নাই; তাহার একটি ছেলে পীড়িত সেজন্য রেবতী পরিবার ও পাঠাইতে পারে নাই। তবে কিছুদিন আগে পূজার অনেক জিনিষ পত্র নৌকা বোঝাই করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে।

আজ মহাসপ্তমী তিথি, বেলা নয়টার মধ্যে পত্রিকার প্রবেশ ও সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইল। তারাকান্ত বাবু নিজে সংস্কৃতজ্ঞ বিদ্বান লোক, তিনি নিজে চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত থাকিয়া পূজার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তন্ত্রধার যদি কোন মন্ত্র পাঠ করিতে ভুল করেন তবে তিনি সংশোধন করিয়া দেন। পূজক মহাস্নানের মন্ত্রগুলি উদাত্তস্বরে পাঠ করিয়া দেবীর অভিষেক সম্পন্ন করিলেন। পরে বিবিধ উপহার দ্রব্য মন্ত্রের সহিত একে একে মায়ের চরণে অর্পণ করিলেন। রাশিকৃত পদ্ম, জবা, রক্তজবা শেফালিকা, অপরাজিতা প্রভৃতি ফুল ও বিল্বপত্রের অঞ্জলি দেওয়া হইল। ধূপ-ধূনা গুগ্‌গুলের রমণীয় গন্ধে গৃহ আমোদিত হইল। তারাকান্ত অনিমেষ নয়নে দেবী প্রতিমার দিকে তাকাইয়া ধ্যান নিমগ্ন রহিলেন। নব পত্রিকার পূজা শেষ করিয়া পুরোহিত বলিদানের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। বলির জন্য দুইটী ছাগ আনা হইল এবং পুরোহিত যথানিয়মে তাহাদিগকে উৎসর্গ করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া বলির বাজনা বাজিয়া উঠিল। পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে বলি দেখিতে পূজার প্রাঙ্গণে সমবেত হইল।

পুরোহিত হাড়িকাঠ উৎসর্গ করিলেন। যে ব্যক্তি পাঠা কাটিবে (ছেদক) সে দেবীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং পুরোহিতের নিকট হইতে খাঁড়া গ্রহণ করিয়া হাড়িকাঠের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই বলিদান ব্যাপারই যেন পূজার বর-মূহূর্ত্ত (Next critical moment) তাই প্রাঙ্গণে সমবেত লোকমণ্ডলীর মনে ভাবটা যেন এই সময়ে উছলিয়া উঠিল। তারাকান্ত গললগ্নীকৃত বাসে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একাগ্রচিত্তে "মা মা" করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি (ধারক) একটি পাঠা আনিয়া "পাছড়াইয়া" হাড়িকাঠে ফেলিয়া খুব জোরে টানিয়া ধরিল। পাঠা একবার করুণস্বরে "ম্যা" করিয়া আর্ত্তনাদ করিল। পুরোহিত তাহার গলায় মন্ত্ররূপ করিয়া, তাহার মাথা টানিয়া ধরিলেন। তখন ছেদক খাঁড়া উঠাইয়া এক কোপ মারিল। এবং পাঠার গলা দুইখণ্ড হইয়া কাটিয়া গেল। তখন সকলে "মা মা" রবে চীৎকার করিয়া যেন একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। একটা নূতন সরাতে পাঠার রক্ত ধরা হইল, এবং পুরোহিত সেই ছিন্নমুণ্ড লইয়া দেবী প্রতিমার সম্মুখে রাখিয়া আসিলেন।

ইতিমধ্যে ধারক দ্বিতীয় ছাগটিকে আনিয়া হাড়িকাঠে ফেলিল। পুরোহিত পূর্ব্বের ন্যায় তাহার গলায় মন্ত্ররূপ করিয়া, তাহার মাথা টানিয়া ধরিলেন। ছেদক ও পূর্ব্বের ন্যায় খাঁড়া তুলিয়া জোরের সহিত আঘাত করিল, কিন্তু—কি সর্ব্বনাশ! এবার পাঠার গলা কাটিল না, সামান্য একটু চামড়া কাটিল। তখন ছেদক আবার খুব জোরের সহিত খাঁড়া তুলিয়া কোপ মারিল। এবার পাঠার গলা কাটিয়া গেল। আর একটি সরাতে তাহার রক্ত ধরা হইল, এবং পুরোহিত তাহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া দেবী প্রতিমার সম্মুখে রাখিলেন।

যখন পাঠা এক কোপে কাটিল না, তখন "পাঠা ঠেকিয়াছে" বলিয়া চারিদিকে একটা অস্ফুট কলরব শুনা গেল। তারাকান্ত ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে আশ্বাসের বাণী শুনাইল না। তিনি তাঁহার নিজের চক্ষুকেও অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখানেই বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বাদ্য থামিয়া গেল। একটি ভৃত্য পাখা আনিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। তাঁহার গৃহিণী বরদা সুন্দরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার কাছে আসিয়া কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলেন,—

"ওগো, কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো! আমাদের কি হবে গো!" তারাকান্ত কোন উত্তর না দিয়া একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কোন একটি ঘোর আগন্তুক অমঙ্গলের ছায়াপাত হইয়াছে, ইহা যেন তাঁহার অন্তরাত্মা তাঁহাকে জানাইয়া দিল।

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

দেখ আমার জীবনে এ বাড়ীতে আর দুইবার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহাতে প্রথমবারে ছোট খোকা মারা যায়, আর শেষ বারে ভাসুর ঠাকুর মারা যান। এবার মা'র

কি ইচ্ছা তা' তিনিই জানেন। পূজার নিশ্চয়ই কোন বিঘ্ন হইয়া থাকিবে। সেজন্য একটা শান্তি করা আবশ্যক।"

তারাকান্ত তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"পূজা ত আমি নিজে সব সময়ে থাকিয়া দেখিতেছি, কই কোন অনিয়ম হইয়াছে বলিয়া ত জানি না। মায়ের মনে কি আছে তা তিনিই জানেন। আচ্ছা, আমি এখনই স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে ডাকাইতেছি।"

বলিদানের পর পুরোহিত ঠাকুর ছাগমুণ্ড ও রুধিরের সরা যথারীতি উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে গ্রামের প্রাচীন পণ্ডিত গদাধর স্মৃতিরত্ন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারাকান্ত নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়াছিলেন. স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বলিলেন—

"দাদামহাশয়, বড়ই বিপদ উপস্থিত। আপনি ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন,—"কোন চিন্তা নাই ভাই। মা যেমন বিপদে ফেলেন, তেমন আবার উদ্ধারও ত করেন। বলি বিঘ্ন অনেক সময়ে হইয়া থাকে। শাস্ত্রে তাহার বিহিত আছে। এখনই আর একটি ছাগল আনিয়া তাহা বলি দিতে হইবে। আর যে ছাগলটি ঠেকিয়াছে, তাহার ১০৮ খণ্ড ক্ষুদ্র মাংস দ্বারা হোম করিতে হইবে, বলি বিঘ্ন নিবারণের ইহাই শান্তি। এখন এই সপ্তমী থাকিতে থাকিতে সেই ব্যবস্থা কর।"

পুরোহিত দিগম্বর চক্রবর্ত্তী বলিলেন—"আমিও সেই কথাই ত কর্ত্তাকে বলিতেছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাকে এ পর্য্যন্ত এইরূপ হোম কোথাও করিতে হয় নাই। তাহার মন্ত্রাদি কিরূপ তাহা আমাকে বলিয়া দিন।

স্মৃতিরত্ন বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি বলিদান অন্তে হোমের আয়োজন কর, আমি নিজেই আসিয়া হোম করাইব।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে আর একটি ছাগল উৎসর্গ করা হইল এবং সেই ছেদকের দ্বারা বলিদান দেওয়া হইল। এবার কোন বিঘ্ন ঘটিল না। পরে স্মৃতিরত্ন মহাশয় আসিয়া পূর্ব্বের সেই ছাগ মাংস দ্বারা হোম করাইলেন। তখন যথারীতি অন্নভোগ দেওয়া হইল। কিন্তু এত করিয়াও তারাকান্তের মনে শান্তি আসিল না। কোন্ এক অনির্দ্দেশ্য বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার মন উন্মুখ হইয়া রহিল

৩

সন্ধ্যাআরতির পর তারাকান্ত দিনান্তে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় নির্জ্জনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হরকান্ত আসিয়া কাছে বসিল। হরকান্ত

কলিকাতায় থাকিয়া বি-এ পড়িতেছে। তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রেবতীর আজ কোন চিঠি এসেছে? তার ছেলেটি কেমন আছে?" হরকান্ত বলিল—"না, আজ কোন চিঠি আসে নাই। দাদা বোধহয় মফঃস্বলে ঘুরিতেছেন।"

"সেখানে চিকিৎসা কিরূপ চলিতেছে, কে জানে। নানা কারণে আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছে।"

"বাবা, আমি একটা কথা বলিতে চাই। আজকাল অনেক পূজা বাড়ীতেই দেখি পাঠাবলি উঠিয়া গিয়াছে। আমাদেরও বলি না দিলে কেমন হয়?"

"কিন্তু বলি চিরদিন চলিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ এই বহুদিনের প্রথা তুলিয়া দিলে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে বুঝি না।"

"পাঁঠা ঠেকিলেও ত অমঙ্গল হয়?"

"অমঙ্গল হওয়ার আশঙ্কা হয় বটে। অমঙ্গলের পূর্ব্বসূচনা বলিতে পার, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Forboding কিন্তু বলি উঠাইয়া দিলেই কি সেই অমঙ্গল ঘটিবে না মনে কর? ঘড়িতে ছয়টা বাজিলে বুঝা যায় শীঘ্র অন্ধকার রাত্রি আসিবে; তোমার ঘড়ি না থাকিলেও তাহা আসিবে। ঘড়ি বরং আগে সাবধান করিয়া দেয়।"

"কিন্তু এই পাঁঠাবলির আবশ্যকতা কি আমি ভাল বুঝিনা। কলিকাতায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত একটা ছাপার কাগজ সেদিন দেখিলাম, তাহাতে সেই পণ্ডিতগণ পাঁঠাবলি তুলিয়া দেওয়ার জন্য মত দিয়াছেন।"

"আজকালকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কথা ছাড়িয়া দাও, আবশ্যকমতে সকল বিষয়েই তাঁহাদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সংগ্রহ করা যায়। যাঁরা এই বলিদান প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাঁরাও ত কম লোক ছিলেন না।"

"কিন্তু মা দুর্গা কি তাঁহার সৃষ্ট একটি ছাগলের নিষ্ঠুর হত্যা দেখিয়া প্রীতিলাভ করেন? সেই ছাগলটি যখন কাতরপ্রাণে "ম্যা—ম্যা" আর্ত্তনাদ করে, তখন কি তাঁহার দয়া হয় না?"

"বাবা, কিসে যে মা ভগবতীর তৃপ্তি হয় আর কিসে তাঁহার তৃপ্তি হয় না তা বলা বড় শক্ত। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলিয়াছেন তাঁহার ভোগের জন্যই তিনি এই জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যে মুহূর্ত্তে একটি প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইতেছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি তাহার রক্তপান আরম্ভ করেন; তাহারই নাম পরিবর্ত্তন, ক্ষয়। জীবদেহের প্রতি কাজে যে ক্ষয় হইতেছে, জীবের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সেই ক্ষয় জানাইয়া দেয় এবং আহার ও পানীয় সেই ক্ষতি পূরণ করে। জগন্মাতার এই বিনাশ-লীলা যেমন বিশ্বজগতে চলিতেছে, তেমন জীবদেহেও চলিতেছে। এই কারণ জীবদেহ একটি শ্মশান এবং জগৎ একটি মহাশ্মশান। তিনি নিজের আনন্দে অট্টহাস্য করিতে করিতে এই শ্মশানে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন, এইজন্য তাঁহার একটি নাম শ্মশানবাসিনী। এই দুর্গা প্রতিমাও তাঁহার সংহারলীলার একটি চিত্র, যেখানে তিনি দশহস্তে নানা প্রহরণ ধারণ করিয়া

অসুর বিনাশ করিতেছেন। সুতরাং ছাগলের রক্ত দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইবে কেন ?

"তবে কি আমাদের উপাস্য দেবতা এতই নিষ্ঠুর ? লোকে তবে তাঁহাকে দয়াময়ী বলে কেন ? তাঁহার নিকট করুণা ভিক্ষা করে কেন ?"

"চণ্ডীতেই আছে, সংহারকালে তিনি অতি নিষ্ঠুর, আবার সন্তানের প্রতি তাঁহার অসীম করুণা।"

"তবে ছাগল কি তাঁহার সৃষ্ট প্রাণী, তাঁহার সন্তান নয় ?"

"অবশ্য। কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমরা মানুষেরা কি ছাগলের প্রতি করুণা প্রকাশ কর ? তোমরা খাওয়ার জন্য কত শত জন্তু অবলীলাক্রমে মারিতেছ, তখন তোমাদের মনে তো একথা আসে না ?"

"যে সব জন্তু মানুষের খাদ্য—ঈশ্বর যাহাদিগকে খাদ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ বাধ্য হইয়া সেগুলি মারে। নচেৎ তাহাদের শরীর রক্ষা হয় না।

"তাহা হইলে কথা এই দাঁড়াইল, এই জীবজগতে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও পালনের সঙ্গে সংহারলীলাও চলিতেছে। মানুষ তাহার উপলক্ষ মাত্র। তোমরা খাওয়ার জন্য যে প্রাণীকে বধ কর, তাহার পারলৌকিক কোন উপকার করিতে পারে না ; কিন্তু শাস্ত্রে আছে—পূজার মন্ত্রেও আছে—যজ্ঞার্থে এই পশু সৃষ্ট হইয়াছে, যজ্ঞার্থে তাহাদিগকে বিনাশ করাকে হিংসা বলে না। যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে গমন করে, তাহার সদ্গতি লাভ হয়।"

"তাহ'লে যদি পাঁঠা খাইতে হয়, তবে যজ্ঞের জন্য বধ করিয়া খাওয়াই উচিত।"

"ঠিক কথা। এইজন্য অনেকে বৃথা মাংস খান না। কিন্তু যাঁহারা পূজার সময়ে পাঁঠা বলি দিতে দেখিয়া জীবে দয়ায় অভিভূত হন, খাওয়ার জন্য পাঁঠা কাটার সময়ে তাঁহাদের সে দয়া থাকে কোথায় ? যিনি খাওয়ার জন্যে জীব-হিংসা করেন না, তাঁহার পূজাতেও পাঁঠা বলি দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। শাস্ত্রে এইরূপ সাত্ত্বিক পূজার বিধানও রহিয়াছে।

"বাবা, তবে আজ হইতে মাছ মাংস ত্যাগ করিলাম। আমাদের বাড়ীতেও যেন আর পাঁঠা বলি দেওয়া হয় না।"

"আমিও ত কখন বৃথামাংস খাই না। মাছেও আমার আর স্পৃহা নাই। যদি তোমরা কয় ভাই একমত হও, তবে আগামী বৎসর হইতে বলি বন্ধ করিব। কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলেরা যদি সকলেই তোমার মত "বৈষ্ণব" হয় তবে জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধি হইবে কিরূপে ? বাঙ্গালী এক সময়ে কত যুদ্ধ করিয়া রক্তপাত করিত, এখন তোমরা ছাগলের রক্ত দেখিয়াই মূর্চ্ছা যাও। বাঙ্গালী কৃষক অনেক দিন হইল খাঁড়া সড়কি ভাঙ্গিয়া লাঙ্গল তৈয়ারী করিয়াছে। তোমরাও কালে তোমাদের উপাস্য দেবীকে এক তুলসীর মালা ধারিণী বৈষ্ণবীতে পরিণত করিবে দেখিতেছি।"

পিতার এই কথা শুনিয়া হরকান্ত চিন্তামগ্ন হইল। তারাকান্ত বলিলেন,—"রাত্রি হইয়াছে

এখন তোমরা আহারাদি কর গিয়া। আমার মনটা ভারি খারাপ হইয়াছে আমি একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করিব।"

৪

তারাকান্ত অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শেষ রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, একজন কনেষ্টবল একটি পাঁঠা ধরিয়া নিতেছে, তাহার পিছনে একটি বুড়া মুসলমান স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে এবং পাঁঠা ছাড়িয়া দিতে বলিতেছে। কনষ্টেবল তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া সেই পাঁঠাটি থানায় লইয়া গেল। এই স্বপ্ন দেখিয়া তারাকান্ত জাগিয়া উঠিলেন, এবং নানাবিধ দুশ্চিন্তায় তাঁহার আর নিদ্রা হইল না।

রাত্রি প্রভাত হইলে ডাকের চিঠিতে তারাকান্ত জানিতে পারিলেন, রেবতীর—যে—ছেলেটার ব্যায়রাম ছিল সে পূর্ব্বদিন মারা গিয়াছে; রেবতী ছুটীর দরখাস্ত দিয়াছে; ছুটী মঞ্জুর হইলে শীঘ্রই বাড়ী আসিবে। এই সংবাদে বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তারাকান্ত শোকে কাতর হইলেন, কিন্তু পূজার কার্য্য যথারীতি নির্ব্বাহ করা হইল।

বিজয়ার দিন রেবতীর পরিবার আসিয়া পৌছিল। রেবতীর ছুটীর হুকুম এখনো আসে নাই, রেবতী সেই অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রেবতী তাহার একজন থানার কনেষ্টবলকে সেই সঙ্গে পাঠাইয়াছে। তারাকান্ত তাহাকে দেখিয়াই চিনিলেন—এই ব্যক্তি তাঁহার সেই স্বপ্নে দৃষ্ট কনষ্টেবল। তারাকান্ত তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন,—

"দেখ, তুমি কতদিন ঐ থানায় আছ?"

"আজ্ঞে, অষ্টমাস।"

"রেবতী যে সকল পূজার জিনিষ পাঠাইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটা পাঁঠা ছিল। সে পাঁঠাটা তোমরা কোথায় পাইয়াছিলে?"

"আজ্ঞে, সেটা আসামী করিমের মার। করিমকে যখন দারোগা বাবু চুরির সরোজে ধরিয়া আনেন, তখন করিমের মা দারোগা বাবুরে ঐ পাঁঠাটা খাতনের জন্যে দিছিল।"

"সে ইচ্ছা করিয়া দিয়াছিল?"

কনেষ্টবল একটু হাসিয়া বলিল—"আজ্ঞে করতা, পুলিশেরে কেউ কি ইচ্ছা ক'রে কোনো জিনিস দেয়? দারোগাবাবুর পাঁটাডা দেইখা খুব মনে ধরছিল—খুব জালুম জুলুম করছিল কিনা—সেইজন্য আমারে পাটাডা আন্‌বার হুকুম দিলেন, আমি তার দড়ি ধইরা থানায় আলোনের কালে করিমের মা বুড়ি কত কাঁদাকাটা সুরু কইরা ছিল। থানায় আইয়া দারোগা বাবু কইলেন, এমন ভালো পাঁটাডা, এডা এখন খাতনের দরকার নাই, এডা বাড়ীতে পূজার লেগে পাঠাইয়া দিমু।"

তারাকান্ত স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা হাতে হাতে ফলিল দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

হইলেন। তখন মা দুর্গা এই ডাকাতির পাঁটা কেন গ্রহণ করেন নাই, তাহা বুঝিতে আর বাকী রহিল না। বিশেষ তাঁহার দারোগা পুত্র এই পাঁঠাকে আগেই একরকম মনে মনে খাইয়া বসিয়াছে। পুত্রের প্রতি তাহার অত্যন্ত ঘৃণা হইল।

যাহার পাঁঠা জোর করিয়া আনিল, তাহার চুরি মোকদ্দমা কি হইল জানিবার জন্ত তাঁহার কৌতুহল হইল। তাই কনেষ্টবলকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আচ্ছা, তোমরা ত করিমকে চুরি কচ্ছে বলে ধরিয়া আনিলে; তাহার কি হইল?"

"আজ্ঞে করৃতা, করিম তার মুনিবের সঙ্গে ঝগড়া হোছিল, সেই আক্‌কোরোষে মনিব ক্ষেত্তের তলে পাট চুরি করেছে বলে থানায় এজাহার ছ্যায়। দারোগা বাবু তদারক কইরা করিমেরে চালান ছ্যান। মেজেষ্টেরের বিচারে তার জেল হয়, কিন্তু জজ সাহেব আপীলে তারে খালাস দিয়েছেন, আর মোকদ্দমা বানোয়াট্ বইল্যা রায় দিছেন।"

"তবে এ মিথ্যা মোকদ্দমা দারোগা বাবু চালান দিলেন কেন?

কনেষ্টবল হাসিয়া বলিল—"করতা, আমি আর কি করমু। করতা কোন্ কথা না জানেন।"

তারাকান্ত আর শুনিতে চাহিলেন না। তিনি মা দুর্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"মা রেবতীর যেন আর দারোগা-গিরি কার্য্য না থাকে।" এবার মা দুর্গা যথার্থই তাহার প্রার্থনা শুনিলেন।

রেবতী পরদিন বাড়ী আসিয়া বলিল, করিমের মোকদ্দমায় ঘুষ নেওয়ার ফলেই তাহাকে সস্‌পেণ্ড—করা হইয়াছে।

এই সংবাদে রেবতীর মা, স্ত্রী প্রভৃতি কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। কারণ এই বিপদের উপর বিপদ তাঁহাদের নিকট অসহ্য বোধ হইল। তারাকান্ত সকলকে বুঝাইলেন,—মা জগদম্বা আনন্দময়ী, তিনি যাহা করেন তাহা ভালরই জন্ত; তারাকান্ত কিছুতেই আর পুত্রকে পুলিশের চাকরি করিতে দিবেন না। তাঁহার সেই সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, বিদ্বান ছেলে এই পাঁচ বছরে কি হইয়াছে, এখন সে মানুষ না পশু?

রেবতী তিনমাস সস্‌পেণ্ড অবস্থায় থাকিয়া অনেক কৈফিয়ৎ দিয়া আবার চাকরি পাইল, কিন্তু তাহাকে এসিষ্টাণ্ট সব-ইন্‌স্পেক্টারের পদে ডিগ্রেড করা হইল। তখন সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরের ছেলে ঘরে আসিল। কিন্তু সে তাহার পূর্ব্বেকার নির্ম্মল চরিত্র আর ফিরিয়া পাইবে কি?



'খেলারসাথী' শিল্পী—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী

প্রলয়ের পূর্ব্বে

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা ৭টা, পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন।

দিল্লীর ছোট ডাকগাড়ীখানি একটি ছোট ষ্টেশনে থামিতেই একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। যেন অনেক লোক আলো হাতে, লাঠি বগলে গাড়ীর এ-দরজা ও-দরজা ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কলরব থামিয়া গেল এবং একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরার দ্বার খুলিয়া বিনয়নম্রকণ্ঠে কে যেন বলিল—এই গাড়ীতেই আপনার বার্থ রিজার্ভ করা আছে।

ইহার প্রত্যুত্তরে রমণী-কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, ধন্যবাদ।—সঙ্গে সঙ্গেই একটি সুবেশা মহিলা কামরায় প্রবেশ করিলেন। এদিক ওদিক একটু দেখিয়া, তিনি বাহিরে—প্লাটফর্মে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণকে প্রত্যাভিবাদন করিতে লাগিলেন।

একখানি বেঞ্চে একখানা দিশী কম্বলে আপাদকণ্ঠ আবৃত করিয়া এক বর্ষীয়ান পুরুষ শায়িত ছিলেন; চশমার কাচের মধ্য দিয়া, রমণীকে দেখিয়া তিনি যেমন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, রমণী একদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিয়া লইয়া, ততোধিক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিয়া উঠিলেন—Thank God !

ভদ্রলোকটি আরও বিচলিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাঁহার কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়-ভাবের দিকে বিন্দুমাত্র মনযোগ না দিয়া, মহিলাটি অপর বেঞ্চে শয্যাসজ্জায়-নিযুক্ত ভৃত্যের কর্ম্মে মনিবেশ করিলেন।

এই অবসরে ভদ্রলোকটি কম্বলটি ঠেলিয়া, আস্তে আস্তে কতকটা উঠিয়া বসিয়া, অপ্রতিভের মত এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন এবং গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ায় যেন কি একটা কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা হইয়াছে ইহারই ত্রুটী-বেদনায় আপনাকে অতিশয় পীড়িত বোধ করিতে লাগিলেন!

শয্যা-সমাপনান্তে মহিলার ভৃত্য স্নানকক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বারটি খুলিয়া অন্তর্দ্ধান করিতে, মহিলা শয্যাপ্রান্তে বসিয়া, একবার খর-দৃষ্টিতে সহযাত্রীর পদনখ হইতে কেশাগ্রভাগ; তাঁহার শয্যা, ব্যাগ, র‍্যাগ, জুতা দেখিয়া লইলেন! তারপর সস্মিতমুখে কহিলেন—একজন বাঙ্গালী সহযাত্রী পেয়ে বড়ই আনন্দ হো'ল। Thank God. কি উৎকণ্ঠাই না হয়েছিল!

ভদ্রলোকটি বুঝিলেন, ইহার একটা কিছু উত্তর দেওয়া উচিৎ কিন্তু সে-উত্তরটা যে কি, তাহা

ভাবিয়া পাইবার পূর্বেই, শুনিলেন, মহিলা পুনশ্চ বলিতেছেন—বিদেশী সহযাত্রীর সঙ্গে এক গাড়ীতে যাওয়ার চেয়ে অস্বস্তিকর আর কিছু নেই।—আপনি কি অনেকদূর যাবেন?

এবারের উত্তরের জন্য ভাবিতে হইল না; ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—আমি দিল্লী যাব।

আমিও ত তাই!—বলিয়া মহিলা মণিবন্ধবদ্ধ ব্যাগটি খুলিয়া বিছানায় রাখিলেন; হাতের পাখাখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—ও, পাখা দু'খানা বন্ধ আছে যে!—উঠিয়া, দুইটা বোতাম টিপিয়া দিলেন।

ভদ্রলোকটি ঘণ্টা তিনেক পূর্বে গাড়ীতে উঠিয়াছেন, ঐ দুইটা বস্তুর অস্তিত্ব তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। এখন বিস্ময়ব্যগ্র দৃষ্টিতে বিঘূর্ণিত-পক্ষ পাখার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

মহিলাটি এইবার বিছানায় ফিরিয়া আসিয়া, একখানি বাঙলা বহি বাহির করিয়া পড়িতে বসিলেন। এবং তাঁহার সহযাত্রীটি অত্যন্ত বিপন্নভাবে বহিখানির মলাটের উপর সোনার অক্ষরে ছাপা কথা-কয়টির উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া, ম্লানমুখে বসিয়া রহিলেন। কাঁচাপাকা ও অসংস্কৃত গোঁফদাড়ীবিশিষ্ট সরু মুখখানা এত অধিকমাত্রায় শুষ্ক দেখাইতেছিল যে হঠাৎ কেহ তাঁহাকে দেখিলে ভাবিত, বুঝিবা এইমাত্র তিনি একটা বিষম শোক সংবাদ শুনিয়াছেন।

গাড়ী অবিরামগতিতে ছুটিয়াছে; সম্মুখোপবিষ্টা রমণী-হস্ত-ধৃত পুস্তকের পৃষ্ঠা তদ্রূপ বেগে না হৌক, ছুটিতেছে। রক্তাভশুভ্র পেলব হাতখানি ক্ষিপ্রতার সহিত পাতা উল্টাইয়া দিতেছে।

ভদ্রলোক আপনার-মনে কহিলেন—ভগবানকে ধন্যবাদ! তিনি যেন কখনও স্ত্রীলোক সহযাত্রী না দেন!" ভদ্রলোকটি বিনা-মুকুরেই আপনার অস্বাচ্ছন্দ্য-আড়ষ্ট ভাবটি দেখিয়া বড়ই লজ্জানুভব করিতেছিলেন এবং অকষ্ট-বদ্ধতা হইতে মুক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা না পাইয়া, তিনিও একখানা কেতাবের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহার শয্যাতেই একখানা কেতাব পাওয়া যাইবে, কিছুক্ষণ এদিক ওদিক, তলা উপুর বৃথা সন্ধান করিয়া, চটিটা পায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং কক্ষ-কোণ-রক্ষিত চামড়ার পোর্টম্যাণ্টু-টা টানিয়া টুনিয়া খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয়, সেটা চাবিবন্ধ ছিল, অনেক প্যাঁচ সহিয়াও পূর্ববৎ বন্ধই রহিয়া গেল। তখন বোধ করি ভদ্রলোক প্রাণহীন এই দুর্বৃত্তের অবাধ্যতার কারণ বুঝিলেন; দাঁড়াইয়া ট্র্যাক, কামিজের বুক-পকেট, পরে আলনা-বিলম্বিত কোর্টের পকেটে চাবির সন্ধান করিলেন কিন্তু চাবির গুচ্ছটাও এই অন্যমনস্ক প্রভুর মনস্তুষ্টি-বিধানার্থ দেখা দিল না। তখন গুচ্ছটি অবশ্যই ভৃত্যের নিকটে আছে সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি শয্যায় ফিরিলেন। বালিশটাকে যথাযোগ্যভাবে বিন্যস্ত করিতে গিয়া চাবিগুচ্ছের ধ্বনি শুনিয়া, বালিশ সরাইয়া চাবি পাইলেন। পোর্টম্যাণ্টু খুলিয়া পুস্তক-অভাবে একখানা পরিদর্শন-খাতা বাহির করিয়া শয্যায় আসিয়া বসিলেন।

রমণী এই সময়ে সহযাত্রীর প্রতি চাহিলেন। তথা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে চঞ্চলচক্ষু পড়িল,

পোর্টম্যান্টুর উপর। ইংরেজীতে লেখা, এ, সি, মুখার্জী, ক্যালকাটা। এই দুইটা ছত্রের মধ্যে কোন জটিল সমস্যা সমাহিত ছিল কি-না বলিতে পারি না, মহিলাটি উক্ত বস্তুটির অধিকারীর আধ-পাকা আধ-কাঁচা কেশ-আচ্ছাদিত মাথাটির পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। যেন কিছু তাঁহার বলিবার আছে, উৎকণ্ঠার ভাব মুখে পরিস্ফুট।

ভদ্রলোকটি সু-দীর্ঘ ও সুপুষ্ট খাতাখানির ভার বহনে অক্ষম হইয়াই বোধ করি সেখানিকে নামাইয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সহযাত্রিণী জিজ্ঞাসিলেন—আপনি আমার কৌতূহল ক্ষমা করবেন। আপনার পুরা নামটি কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি?

ভদ্রলোক এরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; লজ্জাকুণ্ঠ-কণ্ঠে কহিলেন, পুরো নাম? আমার?—অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়!

মহিলাটি পোর্টম্যান্টুটার পানে চাহিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন—ক্ষমা করবেন, আপনি কি সিনিয়র ইনস্পেক্টর অব গবর্ণমেন্ট রেলওয়েস?

অন্নদাবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিলেন—আজ্ঞে হাঁ।

এই দুইটা কথা শেষ না হইতেই মহিলাটির মুখখানিতে যে উচ্ছসিত হাসির তরঙ্গ খেলিয়া গেল, তাহা পরিদর্শন-পুস্তকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি অন্নদাবাবু দেখিতে পাইলেন না, তাহ; দেখিলে নিশ্চয় তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া আগ্রহাকুল স্বরে বলিতেন—হে ভগবান! আমায় তুমি স্ত্রীলোক-সহযাত্রিণীর বদলে যা হয়—ছাই না-হয়, কাবলী-সহযাত্রীই দিও।

অন্নদাবাবু এখন যে পরিমাণ পরিদর্শন-পরীক্ষায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; উপন্যাস-গতপ্রাণা মহিলাটি হস্তধৃত বহিখানার উপর সেই, অথবা অধিক পরিমাণে বিরক্ত হইয়া সেখানাকে নামাইয়া রাখিয়া দিলেন। এবং এবার অতিমাত্রায় বিনয়-ভরে কহিলেন—আপনাকে বড্ড বিরক্ত করছি, মাপ করবেন কিন্তু জানেনই ত, চলন্ত ট্রেণের মত বন্ধুত্ব করার এমন সুন্দর ও সুবিধাজনক স্থান অতি অল্পই আছে।

'বন্ধুত্ব করবার!'—কথাটা যেন সূচের মত তাঁহাকে বিদ্ধ করিল; অন্নদাবাবু তটস্থ হইয়া চাহিলেন।

মহিলা কহিলেন—আপনি দিল্লী যাচ্ছেন ত?

আজ্ঞে হাঁ।

দিল্লীতে কোথায় থাকবেন?

উত্তর দিতে অন্নদাবাবুর বিলম্ব হইতে লাগিল। যদিচ তিনি একটা ভারতীয় হোটেলে অবস্থান করিবেন ইহা কিছুক্ষণ পূর্ব হইতেই একরূপ স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কথা বলিতে সাহস হইল না। যদি তৎক্ষণাৎ পূর্বের মতই শুনিয়া বসেন—ভগবানকে ধন্যবাদ! সেখানেও তিনি আমাকে বাঙালী সহবাসী দিয়াছেন!

অধৈর্য্যভাবে রমণী কহিলেন—এখনো কিছু ঠিক করেন নি বুঝি? কোন আত্মীয়ের বাড়ীতেই থাকবেন বোধ করি।

অন্নদাবাবু কতকটা বরাতঠোকার মত করিয়া বলিলেন—আজ্ঞে না—আমি ইণ্ডিয়া হোটেলে থাকব!

মহিলা এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া, বলিলেন—সে ত বাঙালী হোটেল!

তাতে কি?

আপনি এতবড় একজন পদস্থ···

আঘাত লাগে এমন স্বরে, অন্নদাবাবু ইহার উত্তর দিলেন—কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আমি সাহেব নই।—স্বর উষ্ণ।

আচ্ছা, ইণ্ডিয়া হোটেলটা কোথায় বলুন তো? বাদশাহী টাউনে না ইংলিস টাউনে?

তা ঠিক বলতে পারিনে।

আর কখন আসেন নি বুঝি! তাহ'লে ত আপনার বেশ অসুবিধে হবে, মুখুজ্জে ম'শায়! অচেনা যায়গা, কোথায় হোটেল, তার ঠিক নেই······

তার চেয়ে দেখুন, বাঙালী ত, কোন-না কোন সম্বন্ধ কি দিল্লীওয়ালা কারু সঙ্গে আপনার বেরুবে না? দেখুন-না একটু ভেবে! হোটেলে যে কষ্ট পাবেন, তার এতটুকু আগাম সইলে কাউকে-না-কাউকে বের করা যাবেই। সে কি হোটেলের চেয়ে···

অন্নদাবাবু হঠাৎ যেন কি ভাবিয়া পাইয়া চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন—আমি ত হোটেলে থাক্‌ব না।

তবে?

আমার আত্মীয়ের বাড়ী আছে দিল্লীতে।

কি-রকম আত্মীয়?

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

"তবে বুঝি এতক্ষণ রসিকতা হচ্ছিল মুখুজ্জে ম'শায়। অবশ্য তাতে আমি রাগ করি নি, করবও না। যদিচ কোন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে রসিকতা করার সঙ্গে ভদ্রতা ঠিক খাপ খায় কি-না—সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে।

মুখুজ্জে সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন—হোটেলের কথা আমি ভুল করে বলে ফেলিছি। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। ভয়ঙ্কর অন্যায় হয়ে গেছে, একটু মাপ করবেন।

তাই দেখছি—বলিয়া মহিলাটি একবার অন্নদাবাবুর ধুতি, কামিজ, সার্ট, চাদরগুলা, বিশেষ করিয়া অসংস্কৃত কেশ ও মুখমণ্ডল দেখিয়া লইলেন। অন্নদাবাবুর কণ্ঠস্বরে যে উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছিল, মহিলার কাণে তাহা এড়ায় নাই! কিন্তু তৎপ্রতি মনযোগ না দিয়াই, তিনি বলিলেন—আচ্ছা মুখুজ্জে মশাই, আফিসে আপনি নিশ্চয়ই টাই-টুপি পরেন?

ছেলেবেলায় পরতুম।

উপুরওলা সাহেবেরা কিছু বলে না ?

আমার উপুরওলা—আমি।

গবর্ণমেণ্ট ?

গবর্ণমেণ্টের চোখ নেই ; থাকলেও কার পোষাক দেখবার তার অবকাশ নেই।

তবে যে শুনি, বাবুরা সাহেবদের ভয়ে ধুতি চাদর আফিস যায় না।

অন্নদাবাবু যথাসম্ভব ছোট কথায় জবাব দিলেন, সেটা মনের ভুল-ভয়।

ও।—মহিলা আর কিছু না বলিয়া চুপ করিলেন।

অন্নদা আশা করিয়াছিলেন, এইবার তিনি নিঃসংশয়ে অব্যাহতি লাভ করিবেন ; কিন্তু কুগ্রহে আজ যাত্রা করিয়াছিলেন, শনি তাঁহার রন্ধ্রগত। রমণী ছাড়িলেন না ; কিয়ৎ পরেই কহিলেন—আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, আপনি গত বছর 'নাইট' হয়েছিলেন। ওতে যে তা লেখা নেই ? মহিলা ব্যাগটি দেখাইয়া দিলেন।

এই নবলব্ধ পরমাত্মীয়ার প্রশ্নের পর প্রশ্ন অন্নদাবাবুকে যে কিরূপ উৎখাত করিতেছিল, তাহা তাঁহার অন্তর্য্যামীই জানেন। বলিলেন—কারণ ওটা আমি নিজে লিখেছি।

অর্থাৎ আপনি 'স্যার'টা ব্যবহার করেন না। অন্যে নিশ্চয় করে।

তা দেখবার আমার দরকার নেই।

কাটাছাঁটা আড়ম্বর-বর্জিত উত্তরের পশ্চাতে যে কি আছে, তাহা পূর্ব্বাবধিই রমণীর অবিদিত ছিল না ; কিন্তু যে ঈশ্বর রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহার মধ্যে ধৈর্য্যের ও স্থৈর্য্যের দুইটা ছোট-খাট পাহাড় বসাইয়া দিয়াছেন। বিরক্ত-ক্ষুব্ধ না হইয়া, সোৎসাহে 'গল্প' চালাইতে লাগিলেন।

আপনার বাড়ী ক'লকাতাতেই ?

হাঁ।

রমণী মুখখানি অসাধারণ গম্ভীর করিয়া বলিলেন—মুখুজ্জে মশাই, আপনার নিশ্চয়ই বিবাহ হয়েছে।

এবার আর অন্নদা অ-বাক্ হইয়াও পারিলেন না। কোন রমণী যে কোন অপরিচিত পুরুষকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে, সে জ্ঞান তাঁহার ছিলনা। অত্যন্ত বিরক্তভাবে কহিলেন—আমি বিবাহিত।

ছেলে-পুলে ?

অন্নদা লাফাইয়া উঠিয়া, খাতাখানা বিছানায় ফেলিয়া দিয়া, সোজা দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং তখনি যেন নিজ আচরণে লজ্জা পাইয়া, বসিয়া পড়িয়া, অনুতপ্তের মত কহিলেন, একটি ছেলে, একটি মেয়ে !

ধকাস্ করিয়া ট্রেণ থামিল। ষ্টেশনের কুলীরা কি একটা নাম হাঁকিতে লাগিল। মহিলাটির ভৃত্য দ্বার খুলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতেই, তিনি হাত-ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—খানা সাজাও।—মুখ ফিরাইয়া, অন্নদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মুখুজ্জে মশাই, খাবেন না?

অন্নদা বলিলেন—আমি গাড়ীতে খাইনে।

কেন, আপনি কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত?

রাগ করবেন না মুখুজ্জে ম'শায়, আমি দান নেওয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলি-নি আপনাকে। ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত মিলিয়ে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলেছি।—বলিয়া মহিলাটি নিজেই হাসিতে লাগিলেন।

অন্নদা উত্তর দিলেন না।

মহিলা কহিলেন—আমার সঙ্গে খাঁটি হিন্দু-খাবার আছে মুখুজ্জে মশায়; গঙ্গাজলে স্যাণ্ডটিফায়েড, আপনার জাত যাবে না।—বলিয়া তিনি উঠিয়া ভৃত্য-কামরার ঘণ্টার বোতাম টিপিলেন।

ভৃত্য আসিলে, কহিলেন—দু'টো খানা সাজা।

অন্নদা বলিলেন—রাত্রে, গাড়ীতে আমার ঘুম হয় না, হজম হয় না!

লঘু খাদ্য, ভয় নেই—হজম হবে; আর জাতও অটুট থাকবে।—বলিয়া একখানা সজীব প্রতিমার মত মহিলাটি স্নান-কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

অন্নদা এইবার সত্য সত্যই বলিয়া উঠিলেন—Thank God! মুখে কাপড়ে রসুন হিং ও পোষাকে ঘামের গন্ধশুদ্ধ একটা নোংরা কাবলীওয়ালাও যে ইহার চেয়ে ভাল ছিল।

মহিলাটি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে কহিলেন—মুখুজ্যে ম'শায় দেখছি খুবই বিরক্ত হয়েছেন।

মুখুজ্জে উত্তর দিলেন না।

মহিলা বলিলেন—হঠাৎ কাবলী-কাবলী করে চেঁচাচ্ছিলেন কেন, মুখুজ্জে মশায়?

কাবলী?

হ্যাঁ—এই যে দরজা খুলতে খুলতে শুনলুম।

মুখুজ্জে মহাশয় অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন—না, এমন কিছু নয়।

এমন-কিছু না হতে পারে। তেমন কিছু ত বটেই। তাই বলুন-না, দয়া করে',—শোনা যাক্!

মুখুজ্জে মহাশয় বিনয়-নম্র-কণ্ঠে, আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন—কাবলীকে ভয় না করে কে? তাদের জুতা থেকে পাগড়ী, লাঠি থেকে ভাষা—সকলকারই পিলে চমকে দেয়! আমি কিন্তু ছেলেবেলায় ঝগড়া করে' এক কাবলির হাতেরই লাঠি কেড়ে—এক লাঠিতে যমের বাড়ী পাঠিয়েছিলুম।—বলিতে বলিতে মুখুজ্জের মুখখানি হর্ষদীপ্ত হইয়া উঠিল।

অপর্ণা ব্যঙ্গস্বরে কহিল—বলেন কি মুখুজ্যে ম'শায়? আপনি? এক লাঠিতে, এক কাবলী? আস্ত কাবলী ত মুখুজ্জে ম'শায়?

ইহার ইতর রসিকতায় কাণ দিতেই ঘৃণা হয়; উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা।

অপর্ণা যষ্টি-বৎ দেহখানির আপাদমস্তক লক্ষ্য করিতে করিতে বলিলেন—বললেন না ত, জ্যান্ত না মরা? ওঃ, তবে বুঝি জ্যান্তও নয়, মরাও নয়—আধমরা! তাই হ'বে। তা আপনি পারতে পারেন বটে!—বলিয়া উচ্চৈস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"যান যে মুখুজ্জে মশাই!"

অন্নদা বলিলেন—আমি অন্য একটা কামরা দেখে আসছি।

কেন?

আপনার শোবার অসুবিধে হবে!

কিছু না! এইত আমি দিব্যি শুইছি!

অন্নদাবাবুর মুখ মেঘাবৃত হইল। খাইতে বসিয়া, যে সন্দেহ-মেঘখানা তাঁহার মনের শেষপ্রান্তে উঁকি দিয়াছিল, তাহা এখন সলিল-সম্ভার সমৃদ্ধ হইয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। কস্মিনকালে কোন ভদ্রমেয়ে কি একজন অপরিচিত পুরুষের পাতে খাইতে বসিবার প্রবৃত্তি পোষণ করে? এই স্ত্রীলোকটা তাহাই খাইল। আবার এক্ষণে বলিতেছে, তাঁহার উপস্থিতিতেও সে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করিবে না। যাক্—সন্দেহটা বিদূরিত, হওয়াতে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিকে কতকটা শান্তি বোধ করিলেন এবং অন্য দিকে সন্ত্রস্ত হইয়া অন্য একখানা কামরায় যাইবার জন্য দ্বার খুলিলেন।

মহিলাটি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ওকি, আবার যান যে? আপনার কি মাথা খারাপ আছে নাকি?

না; অন্য গাড়ীতেই আমায় যেতে হ'বে।

এতক্ষণ যে ভদ্রতার সঙ্গে একটা আত্মকলহ চলিতেছিল, সন্দেহ দূরীভূত হওয়ার পর আর সে উপদ্রব রহিল না। কঠিনকণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় ফুট-বোর্ডে পা বাড়াইলেন।

মহিলাটি কহিলেন—দোহাই মুখুজ্জে ম'শায়, গাড়ী খালি করে যাবেন না। কোন্ গোরা মোরা উঠে পড়ে, সমস্ত রাত্রিটা ভয়াবহ করে তুলবে।

কিন্তু... ...

এর পরে আর 'কিন্তু' থাকতে পারে না মুখুজ্জে ম'শায়। চুপ চাপ শুয়ে পড়ুন—আমি না-হয় আর কথা কইব না।

মুখোপাধ্যায়-মহাশয় মুহূর্ত্তকাল কি-ভাবিলেন, তারপর স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন।

মহিলা বলিলেন—শুয়ে পড়ুন মুখুজ্জে ম'শায়। আপনার দিকের বাতিগুলো বরং নিবিয়ে দিন।

চমকিত ব্রাহ্মণ সন্তান—না থাক্—বলিয়া সেই ভারী, শুঁয়া-ওঠা কুটকুটে কম্বলখানা টানিয়া এবার—আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া সটান শুইয়া পড়িলেন।

মহিলাটি এতক্ষণ যেন অভিনয় করিতেছিলেন; দর্শকের দৃষ্টির আড় হইতেই, খুব এক-চোট প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লইলেন। পাছে হাসির শব্দ অদূর-শায়িত সহযাত্রিটির মনযোগ আকর্ষণ করে, মহিলা অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া পুস্তকে মন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু এরূপ অবস্থায় উপন্যাসে-বর্ণিত কাল্পনিক ঘটনায় মন স্থির রাখাও দুঃসাধ্য।

মিনিট কয়েক অতীত হইল। একটা ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। তৎক্ষণাৎ একটা ষ্টেশন-পোর্টার "অর্পণা দেবী, এইট্-আপ ডিল্লি একসপেরেস" হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া যাইতেছিল, মহিলাটি শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন—মুখুজ্জে ম'শায়, লোকটাকে ডাকবেন অনুগ্রহ করে?

মুখোপাধ্যায়-মহাশয় ইহার ত্রি-সীমানার মধ্যে আপনাকে রাখিবেন না এইরূপ কৃত-সঙ্কল্প থাকা সত্ত্বেও রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত ব্যাকুলতার আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিবামাত্র পোর্টারের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল—অর্পণা দেবী, এইট্-আপ "ডিলি এক্সপেরেস!" মহিলা ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন—আমারই নাম অর্পণা দেবী; বোধ করি কোন টেলিগ্রাফ আছে। এই যে, মোহন এইছিস্? ওরে দেখ দিকিন, কি খবর?—ভৃত্য আদেশ শুনিয়া বাহির হইয়া গেল এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যেই টেলিগ্রাফ-খাম হাতে ফিরিয়া আসিল।

তার পাঠ করিয়া অর্পণা-দেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ বাঁচলুম, যে ভাবনাটা হ'য়েছিল, না জানি কি খবর আসে!

ভৃত্য মোহন সবিনয়ে জিজ্ঞাসিল—কি খবর এল মা!

বাবু কাণপুরে আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে যোগ দেবেন—মুখুজ্জে ম'শায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—আমার স্বামী তার করেছেন। তিনি কাণপুরে meet করবেন। ভালই হ'ল; মুখুজ্জে ম'শায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে'খন; তিনিও মুখুজ্জে!

মুখুজ্জে ম'শায়ের বিস্ময়-স্তব্ধ কণ্ঠ ভেদ করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারেই বাহির হইয়া পড়িল—স্বামী!

হ্যাঁ। তিনি টুরে বেরিয়েছিলেন, কাণপুরে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মোহন বলিল—কাণপুরে আমরা কখন পৌঁছুব মা?

কাল সন্ধ্যায়।

মোহন নিঃশব্দে একটি নমস্কার করিয়া রাতের মত বিদায় লইল। অর্পণাদেবী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—তোরা ঘুমুতে পারিস মোহন। এখানে মুখুজ্জে ম'শায় আছেন, কোন ভয় নেই।

মোহন নতশিরে আদেশ পালন করিতে গেল।



বোধিসত্ত্ব (চীনদেশীয়) তাং যুগের

অর্পণাদেবী বলিলেন—মুখুজ্জে ম'শায় কি ঘুমুচ্ছিলেন ?

মুখোপাধ্যায় গম্ভীরস্বরে কহিলেন—না।

ওঃ হ্যাঁ, তাও ত বটে! আপনার ত রাত্রে ঘুম হয় না, আপনি ব'লছিলেন বটে! তা আসুন, গল্প করা যাক্, ট্রেণে আমারও ঘুম হয় না।

অন্নদার ভিতরে ক্রোধ সঞ্চিত হইতেছিল, সাড়া দিলেন না।

অর্পণা জিজ্ঞাসিলেন—মুখুজ্জে ম'শায়, আপনি কত মাইনে পান ?

ইহা যে কতদূর ভদ্রতাবহির্ভূত প্রশ্ন, তাহা ত আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না! মুখুজ্জে অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠিলেন।

মুখুজ্জে ম'শাই ত ভাল চাকরীই করেন ; মোটা মাইনেও পান ;—তবে ব'লতে লজ্জা কি!

সাড়ে তিন হাজার!

আমার স্বামী এতদিন কর্মে থাকলে ওই রকমই পেতেন!

ইহা যে মিথ্যা তাহা বুঝিতে অন্নদাবাবুর বিলম্ব হইল না ; অবিশ্বাস-স্বরে জিজ্ঞাসিলেন—তিনি কি ক'রতেন ?

আগে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

যদি সত্য হয়, তবে অনুতাপ-দ্বারা পাপ বিমোচন করিতে হইবে ; মুখোপাধ্যায় মনে মনে ইহা স্থির করিয়া লইয়া বলিলেন—এখন কি করেন ?

মাঝে কাশ্মীর ষ্টেটের জজ ছিলেন, এখন—ব্যবসা করেন।

ও। সার্বিস্ থেকে রিটায়ার করে বুঝি ?—তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান জন্মিল, এই মহীয়সী নারীটি সেই অপগণ্ড বৃদ্ধের তরুণী—হয়, দ্বিতীয় না-হয় তৃতীয় পত্নীর।

আজ্ঞে না। ছেড়ে দিয়ে।

মুখুজ্জে মহাশয়ের কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতেছিল ; উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—কেন ?

সেটা আমি ঠিক্ ব'লতে পারব না মুখুজ্জে ম'শায়। আমি বার বার জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর পাইনি ; নিজেও বুঝতে পারি নে।—আনন্দোৎফুল্লকণ্ঠে কথা কয়টী বলিয়া মহিলাটী সহাস-নয়নে মুখুজ্জে ম'শায়ের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

মুখুজ্জে মহাশয় ইহাতে অধিকতর বিস্মিত হইলেন। কোন স্ত্রীলোক, স্বামীর এতবড় অবিমৃষ্য-কারিতার, একটা অর্দ্ধ-ঐশ্বরিক-শক্তি-সম্পন্ন জেলার কর্ত্তার—নেটিভ ষ্টেটের অতবড় চাকরীতে ইস্তফা দিয়া একটা কি-জানি-কি ছাই ব্যবসায় প্রবৃত্ত হওয়া সত্বেও যে এমন প্রফুল্লভাবে সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা খুবই শক্ত। কিন্তু বিশ্বাস্য হৌক আর অবিশ্বাস্য হৌক ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যকতা মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুভব করিলেন না। পায়ের কাছ হইতে 'রাগটা' টানিয়া মুড়ি দিবার উপক্রম করিলেন।

অর্পণা কহিলেন—মুখুজ্জে ম'শায়ের বয়স কত হবে ?

মুখুজ্জে ম'শায় রাগতভাবে কহিলেন—তা ঠিক বলতে পারিনে।

সেকি মুখুজ্জে ম'শায়, নিজের বয়স—নিজে জানেন না?

না।

ও। আপনাদের বুঝি হিসেব করে নিতে হয়। আচ্ছা তাই হবে। দেখি আপনার দাঁত।

মুখুজ্জে মহাশয় তীর্য্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—দাঁত কেন?

নইলে হিসেব করব কি করে?

দাঁত দেখে বয়স হিসেব করতে হয়?

তা জানেন না বুঝি!

অন্তরনিহিত প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকুর মর্ম মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুধাবন করিতে না পারিয়া আবিষ্টের মত বসিয়া রহিলেন।

অর্পণা মৃদুহাস্তে কহিলেন—মুখুজ্জে মশায়ের স্ত্রী নিশ্চয়ই বয়স বলতে বারণ করে দেন-নি!

মুখুজ্জে ম'শায়ের অন্তরে যে কি প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলিতেছিল, ভাষায় বুঝাইবার সাধ্য আমাদের নাই। যদি এটা কলিকাল না হইত এবং তিনিও আচার-জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ না হইতেন, তবে অবশ্যই এই লজ্জা-সম্ভ্রমহীনা নারী তাঁহার কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেন।

অর্পণা মুখুজ্জে মহাশয়ের অন্তরের কোন সংবাদের জন্য বিন্দুমাত্র ব্যাকুল ছিলেন না; পূর্ববৎ পরিহাসতরল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—মুখুজ্যে ম'শায়ের স্ত্রী আছেন ত? মৌনং—বুঝলাম, আছেন; আচ্ছা মুখুজ্জে ম'শায়, তিনি দেখতে কেমন? সুন্দর নিশ্চয়! এতেও সম্মতি? বেশ! বয়স?—আমাদের বয়সী, না কিছু বেশী? ও, এযে আমারই ভুল; আপনি বয়সের হিসাব রাখেন না! ঠিক! আচ্ছা, এবার গিয়ে তাঁর দাঁত দেখবেন।—একটুক্ষণ থামিয়া পুনরায় কহিলেন—দেখুন মুখুজ্জে ম'শায়, বয়সের হিসাব না রাখাই উচিৎ। ওতে কতকটা সজীব থাকা যায়; সর্বদা মনে করিয়ে দেয় না যে আমি, একটি একটি বছর যাচ্ছে, আর বুড়ো হচ্ছি। কি বলেন?

মুখুজ্জে ম'শায়ের বাক্য হরিয়া গিয়াছিল, তিনি বলিবেন কি? নিজের কর্মক্ষেত্রটির বাহিরে মুখুজ্জে মহাশয় কখনই পদার্পণ করেন নাই; আজ পা দিয়া এত বিস্মিত, এত চমৎকৃত, ও এত বিপর্য্যস্ত হইলেন, সে আর বলিবার নয়। পৃথিবী যে তাঁহার দৃষ্টির আড়াল দিয়া এতখানি অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ত তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বেবিলনের শূন্যোদ্যান তিনি কতটা কল্পনা করিতে পারেন কিন্তু বঙ্গকুলললনার এমন নির্লজ্জ, অশিষ্ট মূর্ত্তি কল্পনা করা কেবলমাত্র অসম্ভব নহে; তাঁহার পক্ষে অতীব কষ্টদায়ক।

অর্পণা মনে মনে হাসিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন—মুখুজ্জে মশাই, রাত হ'য়ে গেছে; ঘুমোন। বলিয়া অর্পণা অন্যদিকে ফিরিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাঁহার সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এবং অবিলম্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

একটা গুরু-ভার-স্পর্শে জাগরিত হইয়া মুখুজ্জে মহাশয় চক্ষু মেলিতেই আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। একটা প্রকাণ্ড কাবুলিওয়ালা তাহার হস্তধৃত বৃহৎ যষ্টিগাছি তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দণ্ডায়মান। প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল, ওপাশের বেঞ্চখানির উপর। স্ত্রীলোকটি তথায় নাই; তাহার বিছানা, বালিশ, কেতাব সব পড়িয়া রহিয়াছে; কক্ষতলে তাহার পোর্টম্যান্টটা খোলা ও কাপড়-চোপড় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া। দেখিয়া মুখুজ্জে ম'শায়ের ভয় হইল।

সভয়ে কাবলীটার পানে চাহিয়া, হিন্দিতে জিজ্ঞাসিলেন—ঐ দিকে যে মেয়েটি ছিল, তাহার কি হইল?

কাবলী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া যাহা কহিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, তাহাকে রেল লাইনে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কি সর্বনাশ! মুখুজ্জে মশায়ের মনে হইতেছিল বটে নিদ্রার মাঝে তিনি যেন কিসের শব্দ শুনিতেছিলেন; একবার উঠিয়া তথ্য লইবার ইচ্ছাও যেন মনে জাগিয়াছিল কিন্তু জাগিলেই আবার পাছে অর্পণার সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় তাই শুনিয়াও শুনেন নাই। এক্ষণে, এতবড় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে শুনিয়া অনুশোচনায় প্রাণটা পুড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। রেলগাড়ীতে চুরি ডাকাতি রাহাজানির সংবাদ তিনি প্রায়ই প্রাপ্ত হন, রেলের অন্যতম প্রধান কর্মচারী হিসাবে তদন্তকার্য্যে প্রবল উৎসাহ থাকিলেও ব্যাপারের গুরুত্ব তিনি আজ যেমন অনুভব করিতেছিলেন, এমনটি আর কোন দিনই করেন নাই।

কাবলি অবোধ্য ভাষায় কহিল—তোমার সঙ্গে কি কি দামী জিনিষ আছে, বিনাবাক্যব্যয়ে এখনি দাও। নতুবা… …তাহার সজীব লাঠিটা কথাটা শেষ করিল।

দিতেছি—বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তিনি 'সাবধানী-শৃঙ্খলের' দিকে হাত বাড়াইতেছেন বুঝিয়াই লাঠিটা খাড়া হইয়া উঠিয়া তাহার গতিরোধ করিল। কাবলি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে সে এতই নির্বোধ নহে; মুখুজ্যে ম'শায় যদি তাহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হন্ তবে তাঁহাকে তাঁহার সহযাত্রিনীটির সমগতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। জীবনের প্রতি যদি বিন্দু মমতা থাকে তবে তাহার ঐ তোরঙ্গ বাক্স খুলিয়া কি আছে দিয়া ফেলুক।

উদ্যত বংশদণ্ড, উদ্ধত দৃষ্টি, সর্বাপেক্ষা উন্নত-দীর্ঘদেহ দেখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতি মাত্রায় আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন।

কাবলি কহিল—দলদি কলো!

অনন্যোপায় মুখোপাধ্যায় বিহ্বলের মত কহিলেন—চাবি আমার চাকরের কাছে; চাবি আনিয়া দিতেছি।

কাবলি বিকটরবে হাসিয়া কহিল—বৃথা হাঙ্গামা করিবার চেষ্টা করিও না; বিপদে পড়বে। ঐ যে ট্রেণ থামল, কোথায় আন তোমার চাবি।

না, চাবি আনিতেছি—বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কাবলি ক্ষিপ্রহস্তে বৈদ্যুতী চাবি বন্ধ করিয়া কক্ষ অন্ধকার করিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোন্ সদুদ্দেশ্য লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে? তিনি যে নিশ্চয়ই সুশীল ও সুবোধ বালকের মত কাবলি যাহা আদেশ করিল, তাহাই পালন করিতে গেলেন, এরূপ ধারণা নিশ্চয় কাহার নাই।

মুখোপাধ্যায় গাড়ী হইতে নামিয়া কয়েকপদ মাত্র অগ্রসর হইয়াই একখানি অন্ধকার প্রথম-শ্রেণীর কামরা পাইয়া, তাহাতেই উঠিয়া পড়িয়া হাতড়াইয়া সাবধানী-শৃঙ্খলটি টানিতে যাইবেন, হঠাৎ ইংরেজ নারী-কণ্ঠে ভীষণ এক আর্ত্তনাদ উঠিল; পরমুহূর্ত্তেই অর্দ্ধবস্ত্রা এক শ্বেতরমণী আলো জ্বালিয়া 'চোর' দেখিয়া, জানালার বাহিরে চাহিয়া প্রাণপণে উচ্চকণ্ঠে, পুলিস, ষ্টেশন-মাষ্টার, গার্ড, ড্রাইভার সকলকেই আহ্বান দিতে লাগিলেন।

'চোর' তাহার বক্তব্য বলিবার চেষ্টা করিতেই, মেম-সাহেব অধিকতর উত্তেজিত হইয়া গার্ড গার্ড শব্দে ষ্টেশন কাঁপাইয়া তুলিলেন। তৎক্ষণাৎ বাতি-হস্তে গার্ড আসিয়া হাজির হইল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় আত্ম-পরিচয় দিলে তখনি সসম্ভ্রমে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন কিন্তু সে প্রবৃত্তি হইল না। এতবড় উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইয়া, সঙ্গে ঠাসা রিভলভার থাকিতে এককালে স্বয়ং এক লাঠিতে এক বিশালকায় কাবলি বধ করিয়াও তিনি যে আজ একটা ক্ষুদ্রকায় কাবুলির ভয়ে নিজের কামরা ছাড়িয়ে, এক নিদ্রিতা রমণীর কক্ষে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ধৃত হইয়াছেন. ইহা যথেষ্ট কলঙ্কের কথা; পরিচয় দিয়া—বিশেষ এই নারীর সম্মুখে—কালিমা বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা জন্মিল না।

গার্ড, ড্রাইভার, ষ্টেশন মাষ্টার, পোর্টার, ল্যাম্পম্যান এককথায় ষ্টেশনে যতগুলি জীব ছিল—সব আসিয়া কামরার দ্বার ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। মুখোপাধ্যায় নীরব; ম্লান; মেম-সাহেব তখন পল্টনের গোরা।

মেম-সাহেব তাঁহাদের প্রতি বেশ একটা প্রভুত্ব-ধ্বনিত স্বরে জানাইলেন, লোকটাকে এখনি পুলিশে জিম্মা করিয়া দিতে যেন দেরী না হয়।

দেরী হইবে না, বলিয়া গার্ড ও ষ্টেশনমাষ্টার উভয়ে রেলওয়ে পুলিশের আস্তানার দিকে অগ্রসর হইলেন।

অর্পণার ভৃত্য জানালার বাহিরে মুখ রাখিয়া সমস্ত ব্যাপারটাই দেখিয়াছিল। তাঁহার প্রভু পত্নীর কামরা-সঙ্গীটি সত্য-সত্যই পুলিশের হস্তে অর্পিত হইল দেখিয়া প্রভু-পত্নীকে সংবাদটা দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া সে কামরায় আসিতে দেখিল, তাহার মনিব-জায়া গলদ-ঘর্ম অবস্থায় দাঁড়াইয়া তোয়ালেতে মুখ মুছিতেছেন। দেখিয়া সে একটা অজানা আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

অর্পণা পরিশ্রান্ত আননে হাস্যরেখা টানিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কি রে মোহন ?

ভৃত্য ইহাতে উৎসাহ পাইয়া কহিল—মা, আপনার সঙ্গের বাবুটিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল !

অর্পণা শশব্যস্তে কহিলেন—পুলিশে ? সে কিরে ?

হ্যাঁ মা, আমি দেখিছি।

কেন ?

তিনি নাকি একটা ঘুমন্ত-মেমসাহেবের গাড়ীতে ঢুকেছিল।

তারপর ?

মেম—গার্ড ডেকে ধরিয়ে দিলে।

নিরতিশয় বিস্ময়ে অর্পণা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল,—তিনিও গুটগুট্ গেলেন, তুই দেখলি ?

হ্যাঁ মা।

অর্পণা একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন ; তারপর কহিলেন—মোহন দৌড়ে যা ত, গার্ড সাহেবকে না-হয় ষ্টেশনমাষ্টারকে, ডেকে নিয়ে আয়। বল যে, মেম-সাহেব ডাকৃছে।

মোহন ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং দুইচারি মিনিটের মধ্যেই উভয়কে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। অর্পণা বলিলেন—আপনারা এইমাত্র যে ভদ্রলোককে পুলিশে দিলেন, তিনি কে তা জানেন কি ? আপনাদের মনিবের মনিব ; তিনি সিনিয়র ইনস্পেক্টর অফ্ গবর্ণমেণ্ট রেলওয়েস। বিশ্বাস না হয়—ঐ খাতা দেখুন।

মুখুজ্জে মহাশয়ের পরিত্যক্ত গদীর উপর সেই মোটা খাতাখানি পড়িয়াছিল, গার্ড সেখানিকে কুড়াইয়া একখানা পাতা উল্টাইতেই 'কি-রকম' হইয়া, ষ্টেশনমাষ্টারের পানে চাহিল ; বাঙ্গালী ষ্টেশনমাষ্টারের মুখ কচি-কলাপাতার মত এক বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

অর্পণা কহিলেন—ওঁরই নাম মিঃ মুখার্জী। উনি এই গাড়ীতেই ট্রাভেল করছেন। বোধ হয় কি-কাজে নেমেছিলেন, উঠবার সময় ভুলে ঐ মেমের গাড়ীতে উঠেছিলেন !

গার্ড ও ষ্টেশনমাষ্টার পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন, ভাবটা—তাইত ! ড্রাইভার সজোরে এঞ্জিনের বাঁশী বাজাইয়া দিল। গার্ড ষ্টেশনমাষ্টারকে জিজ্ঞাসিল—উপায় ?

উপায় আর কি !—সসম্ভ্রমে ছাড়িয়ে আনা। চল।—তাহারা উভয়ে প্রস্থানোদ্যত হইলে, অর্পণা ডাকিয়া বলিলেন—Look here, Guard, আমার নিকট হইতে তাঁহার পরিচয় পাইয়াছেন ইহা প্রকাশ না করিলেই বাধিত হইব।

গার্ড মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, চলিয়া গেল।

মুখুজ্জে হাজতঘরের কড়িকাঠ গণিতেছিলেন। শেষ হইবার পূর্ব্বেই দারোগা গার্ড ষ্টেশন-মাষ্টার প্রভৃতি আসিয়া লম্বা লম্বা সেলাম করিয়া কৃতকর্মের জন্য মার্জনা চাহিতে লাগিল। মুখুজ্জে মশায় নির্ব্বিকারচিত্তে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নিজ কামরায় আসিয়া উঠিলেন। এবং ভুত

দেখিলে সহজ-মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে, অর্পণাকে সামনে প্রশান্তমুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তদ্রূপ চমকিত হইলেন।

অর্পণা বলিলেন—আপনি ত বেশ লোক মুখুজ্জে মশায়। একটি স্ত্রীলোক সহযাত্রী বিপন্ন, কোথায় তা'কে উদ্ধার করবেন তা নয়, একদম গাড়ী থেকেই পালালেন। আমি ঐ ফুটবোর্ড আঁকড়ে কত চেঁচাচ্ছি, মুখুজ্জে মশায়, বাঁচান, রক্ষা করুন, হরি! হরি! মুখুজ্জে মহাশয়ের সাড়াও নেই, শব্দও নেই। ষ্টেশনে ট্রেণ থামতে উঠে দেখি, কামরা খালি। এই বুঝি আপনি একবারে এক-লাঠিতে কাবলী-বধ-কারী? খুব বীর যাহোক!

মুখুজ্জে ম'শায় চিন্তাযুক্তভাবে কহিলেন—আপনাকে না কাবলীটা ফেলে দিয়েছিল?

তা কি আর ম'শাই দেখেন নি? চোখের সামনে কাবলীটা ছোরা দেখিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে, আমায় ধাক্কা দিলে; মশাই কম্বলের ভিতর থেকে মুখ বের করে' পিটপিট করে দিব্যি দেখছিলেন, আবার এখন নেকুটি হয়ে বলছেন, "আপনাকে না কাবলীটা"……আচ্ছা মুখুজ্জে ম'শায়, আমি না হয় আপনার কেউ নই, আমায় বিপন্ন দেখেও পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন কিন্তু আমি না হয়ে যদি আপনার স্ত্রী'ই হতেন, তাহ'লে কি করতেন, বলুন ত? তখনও কি য পলায়তি স জীবতি……

মুখুজ্জে ম'শায় কাতরকণ্ঠে দোষস্খালনের চেষ্টা করিলেন, দেখুন আমি একেবারেই……

অর্পণা বাধা দিয়া কহিলেন—খুব হয়েছে ম'শাই, আর বক্তিমেতে কাজ নেই। আপনি যা বীর তা বেশ বোঝা গেছে! বন্দুকের বাক্স সঙ্গে থাকলেই বীর হয় না। কাবলীটা যে ধাক্কা দিয়েছিল তাতে ত একদম চুরমার হয়ে যাবারই কথা, বিধি সুপ্রসন্ন, তাই, দু'হাতে 'উঠতি' হাতলটা ধরে ফুটবোর্ডে পড়ে রইলাম।

মুখুজ্জে মহাশয় পুনর্বার বলিতে উদ্যত হইলেন—দেখুন……

অর্পণা শুইয়া পড়িয়া, কহিলেন—দোহাই আপনার! আর দেখতে অনুরোধ করবেন না। আমি স্বীকার করছি দু'দুটো বন্দুকের বাক্স আপনার সঙ্গে, সুতরাং আপনি মস্ত বীর; এখন রাত্রের মত অব্যাহতি দিন, ঘুমুনো যাক্!…বলিয়া সটান শুইয়া পড়িলেন।

মুখুজ্জে মহাশয় অত্যন্ত অপ্রতিভের মত শুষ্কমুখে পাংশুনেত্রে সামনে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

একমিনিট পরে অর্পণা সহসা মুখটা খুলিয়া বলিয়া উঠিলেন—ভাল কথা; আপনি গোড়া থেকেই কাবলী কাবলী করছিলেন কেন—বলুন তো মুখুজ্জে ম'শায়? সেই এক লাঠিতে কাবলী-বধের বীর-স্মৃতিই তার কারণ? না আর কোন কারণ আছে? কাবলীর সঙ্গে যৌথ কারবার চলে নাকি? রেলের বাঁধা মাইনের সঙ্গে সেইটে উপরি পাওনা বোধ হয়!

মুখুজ্জে মহাশয়ের বাঙনিস্পত্তি হইল না।

অর্পণা জিজ্ঞাসিলেন—কি ভাবছেন!

তিনি তথাপি নীরব।

আমি বলব, কি ভাবছেন ?

মুখোপাধ্যায় সবিস্ময়ে চাহিলেন।

অপর্ণা কহিলেন—ভাবছেন, কাবলীটা সত্যি কেন আমার দফা শেষ করে দিলে না! এই না ?

মুখুজ্জে ম'শায় ইহারও উত্তর দিলেন না দেখিয়া, অপর্ণা প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন মানসে কহিল—মুখুজ্জে মশায়,... এতক্ষণ ষ্টেশনটায় নেমে পারচারি করছিলেন বুঝি ? সত্যি, আজ যে গরম! দু'খান পাখাতেও শানছে না, আরও খান কতক থাকলে তবে হো'ত ! না ?

মুখোপাধ্যায় বোধ করি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহার কথার জবাব আর দিবেন না; দিলেন-ও না। বাচাল স্ত্রীলোকটিও বকিয়া বকিয়া—অবশেষে শ্রান্তভাবে শুইয়া পড়িলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দিল্লী ষ্টেশনে নামিয়া, অপর্ণা যখন তাঁহার স্বামীর (বলিল ত স্বামী, সত্য মিথ্যা কে তার খবর রাখে) সঙ্গে মোটরে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন,—স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন মুখুজ্জে মহাশয় নিশ্চিন্তমনে একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকাইয়া, ছাদে মোটঘাটরা উঠাইয়া স্বয়ং উঠিয়া বসিলেন। সত্যকথা বলিতে কি, এতক্ষণে যেন তাঁহার ঘাম দিয়া জর ছাড়িল। উঃ ! কি ভীষণ উপদ্রবটাই না জুটিয়াছিল। স্বামীটি ত বেশ শান্ত, শিষ্ট, ভদ্রগোছের লোকটি, কি করিয়া যে ঐ "চারপেয়ে লক্ষীটি"কে সামলাইয়া ঘর করে, আশ্চর্য্য ! দোজপক্ষ, তেজপক্ষ নয়,—উভয়কে দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হইল, প্রথম পক্ষ-ই বটে। তবে উভয়ের মধ্যে অসামান্য প্রভেদ। স্বামীটি নিশ্চয়ই ইহাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু কি করিবে, বেচারী !—বিবাহিতা স্ত্রী, ফেলিতে ত আর পারে না।

ভাবিতে ভাবিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্বশুরালয়ে পৌঁছিলেন। শ্যালক হেমচন্দ্রবাবু হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসিলেন—পথে কোন বিপদ আপদ ঘটেনি ত ?

রেলের সর্বোচ্চ-আসনে অধিষ্ঠিত কোন কর্ম্মচারীকে এবম্বিধ প্রশ্ন করা যে কেবলমাত্র অসম্মানজনক, তাহাই নয়; দস্তুরমত অভদ্রোচিতও বটে। মুখোপাধ্যায় কোন উত্তর দিলেন না। হেমচন্দ্রবাবু কহিলেন—আপনাকে এ-কথা জিজ্ঞেস করলুম ব'লে বিশেষ কিছু মনে করবেন না মুখুজ্জে ম'শায়। জানেন ত, এই সেদিন মধ্য-প্রদেশের রাষ্ট্রপতি বোস ম'শায়ের গাড়ী থেকেই জুয়েলারীর বাক্স চুরী হয়ে গেল। চোরের কাছে সবাই সমান।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—তা বৈকি ! বলিয়া তিনি তখনি—তখনি খাতাপত্র খুলিয়া ডায়েরী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে হেমচন্দ্রবাবু কহিলেন—ও কি এখনি আবার খাতাপত্র খুলে বসলেন যে !

কাজটা সেরে রাখাই ভাল !—বলিয়া তিনি খাতায় মনোনিবেশ করিলেন।

মুখুজ্জে ম'শায়ের স্ত্রী লক্ষ্মীমণির বয়স হইয়াছে। নিরীহ স্বামীর স্ত্রী হওয়ায় এবং চিরকাল স্বামী-স্ত্রীতে 'একা' বাস করায় লজ্জাসরম বিশেষ নাই; হেমচন্দ্রবাবুর সামনেই গজেন্দ্র গমনে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কিগো, আসবার সময় পেয়েছ তবে? চিঠি লিখে লিখে ত হায়রান, না জবাব, না কিছু!

চশমার ফাঁকে চক্ষু তুলিয়া মুখুজ্জে মহাশয় লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার সুশীলা স্ত্রী লক্ষ্মীমণিও আর সে লক্ষ্মীমণিটি নাই। একটু যেন বেশী বাক্‌পটু, বেশী—কি বলে—চঞ্চল তাই হইয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি রমণীর চিত্র মনোমধ্যে ভাসিয়া উঠিতেই মুখোপাধ্যায় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

হেমচন্দ্রবাবু সরিয়া পড়িলেন এবং মুখোপাধ্যায়-পত্নীর কর নিপীড়ন করিয়া বহু কাকতি-মিনতিসহ বহু কৈফিয়ৎ দান করিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখনকার মত অব্যাহতি পাইলেন।

রাত্রি দশটা। আহারাদি হইয়া গিয়াছে। শয়ন-কক্ষে বসিয়া মুখুজ্জে মহাশয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বহি খুলিয়া পাঠ করিতেছেন, হঠাৎ লাঠির শব্দ হইল। চক্ষু তুলিয়া দেখেন, সম্মুখে সেই কাবলী-মূর্ত্তি! মনে হইল, ট্রেণে-দৃষ্ট মূর্ত্তিটিই!

কাবলী বলিল—তখন তুমি বড় ফাঁকি দিয়াছ। এখন মানে-মানে যাহা আছে দিয়া দাও; নতুবা—বলিয়া সেই চারিহস্ত পরিমিত দীর্ঘবংশ-দণ্ড মস্তকোপরি তুলিয়া ধৃত করিল।

মনে-মনে হাসিয়া মুখুজ্জে কহিলেন—দিচ্ছি!

বলিয়া খাট হইতে নামিয়া গৃহ-কোণে রক্ষিত বন্দুকটি হাতে লইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন—লাঠি রাখো, নইলে……

কাবলী কহিল—নেহি রাখে গা!

তবে দেখো!—বলিয়া ঘোড়া উঠাইয়াছেন, লক্ষ্মীমণি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া কহিলেন—কর কি! কর কি! সত্যিই কাবলী ভাবলে নাকি ওকে! ও হরি! ওযে আমার মেজবোন্ অর্পণা!

কাবলী-বেশী অর্পণা কহিলেন—সরে যাও দিদি, সরে যাও। তখন ত পৈতৃক প্রাণের ভয়ে এক মেমের কামরায় ঢুকে পুলিশের হাজতে আটকা পড়ে' আমার দয়ায় বেঁচে এসেছেন, এখন নিজের কোটে পৌছে মুখুজ্জে মহাশয়কে একবার বীরত্বটা দেখাতে দাও!—ছেলেবেলায় নাকি এক লাঠিতে উনি এক কাবলী মেরেছিলেন; নিজেই গর্বভরে গল্প করলেন, সেই বীরত্বটা একবার ওঁকে দেখাতে দাও, দিদি। দেখি উনি সে-কালে কি উপায়ে সমুদ্র পার হয়েছিলেন।—বলিতে বলিতে অর্পণা বামহস্তে 'আলখাল্লার' অভ্যন্তর হইতে একটি ছোট রিভলভার বাহির করিলেন। এক হস্তে সেই বংশাবতংস; অপর হস্তে লৌহ-গঠিত রাক্ষস শিশু! মৃদু মৃদু হাসিয়া অর্পণা কহিলেন—উনি আবার কাবলী-মারা-বীর! লজ্জা করে না বলতে! কাণাকে হাইকোর্ট দেখান আর কি! কাবলীকে 'ডোণ্ট-কেয়ার' করি বটে, এই আমি! যখন কাশ্মীরে থাকতুম, দিদি

ত জানে সব, শুনেছেও, জিজ্ঞাসা করুন, বলবে'খন—কি-রকম গুণ্ডামী করে বেড়াতুম! এক লাঠিতে কি এক চড়ে, কিম্বা এক-কিলে—মারিনি বটে তবু সবাই ভয় করত, মিসেস্ মোকরজীকে! —মুখুজ্জের হাতের বন্দুক খসিয়া পড়িয়া গেল। ভয়ে নয়, লজ্জায়।

লক্ষীমণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—পুলিশের হাজত—অর্পণা সে কি রে আবার?

জিজ্ঞেস্ করনা ঐ বীরবরকে! এই অর্পণাদেবী না থাক্‌লে হাজতের কড়ি গুণে আর মুড়ী খেয়ে মুখুজ্জে-জাকে মারা পড়তে হত কি-না! ওঃ কি আমার বীরপুরুষ গো। একেবারে বন্দুক হাতে তেড়ে উঠ্‌লেন! বলি ট্রেণে যখন কাবলী লাঠি উঠিয়েছিল, তখন ত বন্দুকের কথা মনে পড়েনি?

অর্পণা, পুলিশের গল্পটা কি, তাই বল্ শুনি!

কি গো বীর-পুরুষ! বলি?

প্রলয়ের ঠিক পূর্ব-মুহূর্ত্ত বুঝিয়া মুখোপাধ্যায় রণে ভঙ্গ দিয়া কহিলেন—যা ইচ্ছে তাই কর তোমরা। স্ত্রী-স্বাধীনতার যা সুখ, তা হাড়ে হাড়ে বোঝা যাচ্ছে। থাক্, তোমাদের সঙ্গে অধিক বাক্‌বিতণ্ডা করা নিষ্প্রয়োজন; রাত হয়ে গেছে, আমি বাইরে শুইগে।

মুখুজ্জে মহাশয় বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন তস্য স্বাধীনতা-প্রয়াসী স্ত্রী ও তস্যা ভগ্নী তাহাতেও বাদ সাধিল।

মুখোপাধ্যায় তদবধি তাঁহার আফিসে লেডী-টাইপিষ্ট-পদগুলি উঠাইয়া দিয়া, পুরুষ টাইপিষ্ট ভর্ত্তি করিয়াছেন। নারীদের প্রশ্রয় দিবেন না—প্রতিজ্ঞা।

অবধ্য প্রণয়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১

মামলা রুজু হইয়াছে। ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬।৫১১ ধারা। পুলিশের 'চার্জ-শীট'। স্ত্রীলোকসংক্রান্ত মোকদ্দমা, সুতরাং অন্যান্য মোকদ্দমার পূর্ব্বেই সেটা পেশ হইয়া গেল। বাদী ফকিরচন্দ্র ঘোষ। আসামী ফকিরচন্দ্র দাস। কাষ্ঠ পুত্তলিকার মতো উভয়ে আদালত-গৃহে দণ্ডায়মান। পূর্ব্বে তাহারা মিতালিসূত্রে বদ্ধ ছিল। আসামীর স্ত্রী বাদীর স্ত্রীর অতিদূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী। বাদী কুলি সংগ্রহ ডিপার্টমেণ্টে একটা চাকুরি পাইয়া ছোট-নাগপুরে চলিয়া যায়। যাইবার সময় স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের তার মিতার হস্তে দিয়া যায়। কুলির কারবারে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহার দারণা হইয়াছিল যে দাম্পত্য সূত্রে বদ্ধ হইলেও তাহা হইতে মুক্ত হইবার কোন নির্দ্দিষ্ট কালাকাল নাই। সুতরাং সন্দেহের কালোমেঘ মধ্যে মধ্যে উদয় হইত। মধ্যে মধ্যে পিসীমা সংবাদ দিতেন "বৌমা ভাল আছেন।" কিন্তু 'ভাল আছেন' কথার অর্থ কি? শারিরীক কি মানসিক? বৌমা প্রায় তিন মাসাবধি নিজে সংবাদ দেন না কেন? তাই সন্দেহ গুরুতর হইয়া উঠিল। ফলে, কোনো সংবাদ না দিয়া, ফকিরচন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমান শতাব্দীর, ১৯২৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের, কোনো একটা শনিবারে শ্বশুরালয় পাঁশকুড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঁশকুড়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত, এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকট। পথিমধ্যে কোন শারীরিক কষ্ট না হইলেও মনের উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় শুষ্ককণ্ঠ, ফকিরচন্দ্র ছাতা ও ব্যাগ হস্তে প্রথমেই মিতা ফকিরচন্দ্র দাসের বাটীতে উত্তীর্ণ হইয়া শুনিতে পাইল যে সে তিনমাস বাটী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ফকির দাসের সহধর্ম্মিণী, ঘোষের দূরসম্পর্কীয়া শ্যালিকা, সুতরাং সে অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

'মালতী দিদি বাড়ীতে আছেন?'

স্বামী-বিরহেই হউক, কিংবা অন্য কোনো কারণেই হউক 'মালতীদিদির' মুখ মলিন, সে একদৃষ্টে ফকির ঘোষের দিকে চাহিয়া রহিল।

ফকির ঘোষ। জ্বর টর হয় নাই ত?

মালতী। না।

ফকির। মিতা কোথায়?

মালতী। আমি জানিনে।

কথাটা মৃদু-গম্ভীরভাবে উচ্চারিত হওয়াতে ঘোষজা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইল 'তবে জানে কে?'

মালতী। তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর। তার গতিবিধির কথা সেই জানে। তাকেই চিঠি পত্র লেখো।

স্বতঃই ঘোষজার মনে হইল যে কথাগুলির মধ্যে অন্য কথাও প্রচ্ছন্নভাবে আছে, এবং সেগুলি তলাইয়া তদন্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। 'আচ্ছা' বলিয়া সে চলিয়া গেল।

২

ফকিরচন্দ্র ঘোষ যে খুব চালাক-চতুর তাহা নয়, তবে জানিত যে চিঠিপত্র বাক্সে গুছাই রাখা স্ত্রীলোকের স্বভাব। পূর্ব্বে, তাহার স্ত্রী মধুমতীর দখলে কোনো ছোটো বাক্স ছিল ন কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহার দৃষ্টি একটা ক্ষুদ্র সেগুণকাঠের বাক্সের উপর পতিত হওয়া সে স্থির করিল যে সেই বাক্সটার মধ্যেই চিঠিপত্র আছে। ফকির তাহার শ্বশুরের চরণে প্রণ হইয়া পিসীর নিকট গেল। পিসী আনন্দে অধীরা হইয়া বলিলেন 'আসবার আগে একটা খ দিতে নেই? আর একটু দেরী হ'লে ভাত ফুরিয়ে যেত। বৌমা তোর জন্য ভেবে ভে সারা।'

বৌমার চেহারা দেখিয়া ফকিরের কিন্তু তাহা মনে হইল না। পূর্ব্বাপেক্ষা মধুমতী খুব ফস এবং মোটাসোটা হইয়াছে। সাবানমাখা অভ্যাস হইয়াছে, তার কোনো [illegible] স্বামীর বিরহে তার চ'খের কোণে কালি পড়া উচিত হইলেও সেটা [illegible] ঠিক। স্বামীকে দেখিয়া তার পূর্ব্বস্মৃতি উছলিয়া উঠিবার কথা এবং তাহার কিঞ্চিৎ [illegible]স্মারও কথা, কিন্তু তাহার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, এবং সে বলিল 'এসেছ, ভালই [illegible], নয়ত আমি আজকালের মধ্যে মেদিনীপুরে চলে যেতুম'। মেদিনীপুর ফকিরের পিত্রালয়।

ফকির। কেন?

মধুমতী। আমার বিশ্বাস যে তুমি সেখানেই চলে গিয়েছিলে।

ফকির। কার সঙ্গে যেতে?

মধুমতী। তোমার মিতার সঙ্গে।

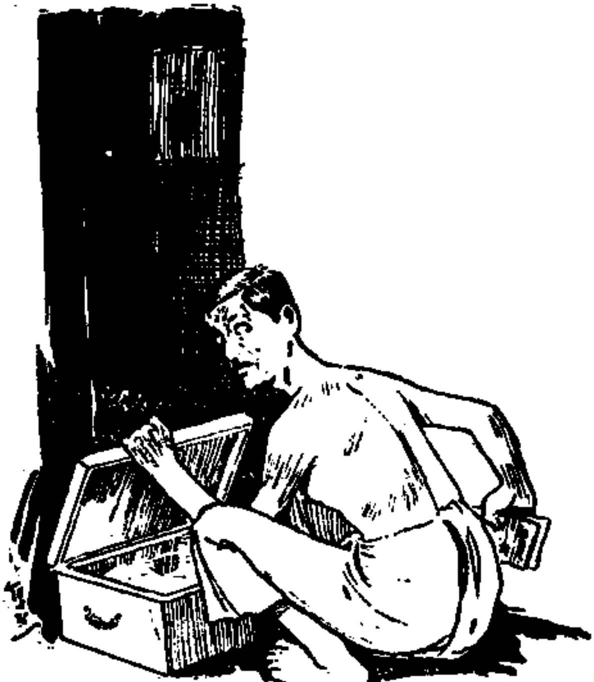
ফকির। সেও সেখানেই চলে গিয়েছে বোধ হয়?

মধুমতী। তার সন্দেহ নেই।

ফকির। তবে তোমার গেলেই ভাল হ'ত।

মধুমতী। তার মধ্যে অনেক কথা আছে, সেইজন্য যাইনি।

ভাত খাইয়া ফকিরের একটু নিদ্রালাভের চেষ্টা করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া সে কেবল বাক্সের দিকে তাকাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার স্ত্রী আহার করিতে গেলে সে



তাহার মাথার বালিশের তলা হইতে চাবি সংগ্রহ করিয়া তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া দেখিল যে একদিকে খানকতক পত্র রেশমী সুতায় বাঁধা। সেগুলির সঙ্গে একখণ্ড কাগজে নোট করা—'প্রেমপত্র'।

কার্য্য হাঁসিল্ হওয়াতে উৎফুল্ল-চিত্তে ফকির ঘোষ সেগুলি পকেটে রাখিয়া, তাহার অন্তরতম বন্ধু জমিরুদ্দী সেখের বাটীতে চলিয়া গেল। সেখ্‌জী শুনিয়াছিল যে ফকিরচন্দ্র মানভূম হইতে কুলির কারবারে প্রায় তিন হাজার টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছে। সুতরাং অতি সসম্ভ্রমে বলিল "ভায়া এস'।

৩

ভায়া ফকিরচন্দ্র মাথায় হাত দিয়া আসনে বসিয়া পড়াতে সেখ্‌জি জিজ্ঞাসা করিলেন 'আর নূতন খবর কি?'

ফকির। তোমাদেরি জান্‌বার কথা।

সেখ্‌জি কিছু গম্ভীরভাবে কপাটের দিকে তাকাইলেন, তাহাতে ফকিরচন্দ্র উঠিয়া সেটা বন্ধ করিয়া দিল এবং মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে মিতার কিরূপ ব্যবহার ছিল তাহার খোঁজ রেখেছ?'

সেখ্‌জি বুঝিতে পারিলেন যে এই সুযোগে দু'টাকা রোজগার করা সহজ, সুতরাং তিনি অতিশয় মৃদুস্বরে বলিলেন 'তুমি কোনো খবর রেখেছ কি?'

ফকির। আপাততঃ খানকতক চিঠি পেয়েছি।

সেখ্‌জি। দেখি—

তিনখানি পত্র মাত্র। কোনোটাতেই নাম নাই।

প্রথম পত্র—"প্রিয়োতোমা—সেদিনের কথা চিরকাল মনে থাক্‌বেক"।

দ্বিতীয় পত্র—"প্রিয়োতোমা—ও কথা বল্‌তে নাইক্।"

তৃতীয় পত্র—"যদি নিশ্চয় ম'রতে হয় তবে আমিই আগে ম'রব। মেদিনীপুরে খবর লবেক্।"

সেখ্‌জি বলিলেন—ওঃ কি জবর চিঠি! খুন-খারাপির কথা! দেখা যাচ্ছে ফকির ঘোষের লেখা। এ রকম পাকা বাংলা এ পাড়ায় কেহ লেখেনা।

ফকির। মধুর বাক্সে পাওয়া গেছে।

সেখ্‌জি। ওঃ কি আপশোষের কথা! আমি প্রায় দুই মাস্ আগে এটা জান্‌তে পেরেছি।'

ফকির। কিসে?

সেখ্‌জি। কথায়, বার্ত্তায়, হাবভাবে। আরজু মিনতির পালায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ও স্বকর্ণে শুনেছি।

ফকির। আদালতে বল্‌তে পারবে?

সেখ্‌জি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—সত্য কথা হলফান্ বল্‌তে বাধ্য। এখন মতলব কি?

ফকির। থানায় নালিশ করা।

সেইদিনই বেলা ৫টার সময় ফকিরচন্দ্র ফাঁড়িতে সুবল সিং জমাদারের নিকট প্রথম এজেলা দর্জ করিল তাহা এই—

ষ্টেশনডাইরি। তাং——বেলা ৫টার সময় ছাএল ফকিরচন্দ্র ঘোষ আসিয়া নালিশ করে যে তাহার বিবাহিত পত্নী শ্রীমতীমধুকে তাহার মিত্র ফকিরচন্দ্র দাসের একবলে নেস্ত করিয়া বিদেশে কর্ম্মকাণ্ডে চলিয়া যায়। এখন সপ্রমাণ যে, আসামী ফকির দাস অতিশয় বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে উক্ত শ্রীমতীমধুর সহিত অবধ্য প্রণয়ে লিপ্ত হওনের চেষ্টা করতঃ মেদিনীপুরে চলিয়া গিয়া মধুকে উপশরণ করিতে পত্র লেখে। অতএব দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬।৫১১ দফার মামলা রুজু করতঃ এজেলা তমলুক মহকুমার সদর দারোগার বরাবর পাঠান হইল।

৪

দারোগা মহাশয় সমূল তদন্ত করিয়া বুঝিলেন যে মোকদ্দমা সত্য, অতএব স্ত্রীলোকদিগের এজাহার লওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না, বিশেষতঃ তাহাদিগকে লইয়া একটা গণ্ডগোল করিলে আসামী সাবধান হইয়া মামলা নষ্ট করিতে পারে। অথচ দণ্ডবিধি আইনের মধ্যে মামলাটা ঠিক পড়ে কিনা, সে সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল। কিন্তু ফকির ঘোষের আগ্রহ এবং বেগ দেখিয়া তিনিও নানাকারণবশতঃ চার্জশীট দেওয়াই সাব্যস্ত করিলেন। অতএব এই মোকদ্দমা।

বাদীর তরফে সাক্ষী সেখ্‌জি, এবং প্রতিবাসী শূন্তকড়ি বাগ্দী এবং বাগ্দীর স্ত্রী ভীমা দাসী।

আসামী সমনে আসে নাই, অতএব তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আনা হইয়াছিল। আসামীর মাতুল একজন মোক্তার। তিনি মেদিনীপুর হইতে ভাগিনেয়কে পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছিলেন। কোর্টবাবু সরকারী 'প্রসিকিউটর'।

সবডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট দুর্গাচরণবাবুর প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা থাকাতে তাঁহারই নথিতে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইল। দুর্গাচরণবাবুর পূর্ব্ববঙ্গে নিবাস, এবং তিনি প্রেমসম্বন্ধে অনেক কবিতা এবং

উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। বড় হাকিম বলিলেন 'বিচারের ভার উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হইল। আমাদের দেশের প্রেমতত্ত্ব দুর্গাবাবু যতদূর আলোচনা করিয়াছেন, তত আর কেহই করেন নাই'

আসামীর তরফ হইতে মোক্তারমহাশয় প্রথম আবেদন পত্র দিলেন যে মামলা দণ্ডবিধি-আইনের কোনো ধারায় চলিতে পারে না ; কারণ স্ত্রীলোক অস্থাবর হইলেও Property অর্থাৎ পদার্থ নহে।

কোর্টবাবু। আমরা ইতস্ততঃ যাহা দেখিতে পাই সকলই পদার্থ। বেদ ও উপনিষদের সময় হইতে স্ত্রী এবং গাভী, গৃহস্থের অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সুতরাং তাহা কাহারও নিকট বিশ্বাস করিয়া গচ্ছিত রাখিলে যদি কেহ তক্রুফ্ করে তবে তাহা ৪০৬ ধারার অন্তর্গত।

মোক্তার। তক্রুফ্ করিবে কি করিয়া ?

কোর্টবাবু। নিজের ব্যবহারে লাগানোই তক্রুফ্, যেমন রন্ধন, গৃহমার্জ্জন, এমন কি খোসগল্প, রসিকতা, প্রেমসম্ভাষণ, প্রভৃতি সকলই তক্রুফের অন্তর্গত। বিশ্বাস না হয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর—

হাকিম দুর্গাবাবু। কোনো দরকার নাই, ওসব আমার আয়ত্ত আছে। আমার সহধর্ম্মিণী নিজেই স্বীকার করেন যে তাঁর চেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি আমার আর কিছুই নাই। কি বল পেশকার ?

পেশ্কার। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ আছে ?

মোক্তার। আমার আপত্তি টুকিয়া রাখুন।

হাকিম। আচ্ছা।

প্রথম আপত্তির উপর হুকুম নথিবদ্ধ হইলে পর বাদী কোর্টবাবুর ইঙ্গিতানুসারে সাক্ষীর বাক্সে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার এজেহার হইয়া গেলে মোক্তারমহাশয় সংক্ষেপে জেরা করিলেন।

মোক্তার। মধু যে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তাহার প্রমাণ কি ?

ফকির। সে আমাকে পছন্দ করে না, ও অন্যকে পছন্দ করে উহাই তাহার প্রমাণ।

মোক্তার। পছন্দ করেনা তাহার প্রমাণ কি ?

ফকির। আমার জন্য তার একটুও বিরহ হয়নি, তাহা তার চেহারা দেখ্‌লেই টের পাবেন।

কোর্টবাবু। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই প্রমাণ। (১৮৭২ সালের সাক্ষীসম্বন্ধীয় আইন)

হাকিম। আইন একটু কড়া। আমার গৃহিণীর প্রেমসম্বন্ধে আমার কোনো অবিশ্বাস নাই, অথচ তাহা কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় নাই। কি বল পেশ্কার ?

পেশকার। হুজুর, আমরা গরীব লোক, কখনো কর্ণেন্দ্রিয় এবং নিতান্ত বাড়াবাড়ি হইলে কখনো পৃষ্ঠেন্দ্রিয় সম্মার্জনী-স্পৃষ্ট হওয়াতে ভালবাসা সপ্রমাণ হ'য়ে পড়ে।

মোক্তার (ফকিরের প্রতি)। তুমি যখন স্ত্রীকে আসামীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বিদেশে যাও, তখন তাহার রক্ষণাবেক্ষণের সর্ত্ত কিছু ছিল ?

কোর্টবাবু। লেখাপড়ায় ছিল না, কথাবার্ত্তায় ছিল।

মোক্তার (কোর্টবাবুকে) তুমি বাদীকে বাহিরে শিখাইয়াছ।

কোর্টবাবু। চোপ, আমি মোক্তারি পেশা করি না।

অবশেষে বাগ্‌বিতণ্ডা মারপিটে দাঁড়াইবার উপক্রম হইলে হাকিম বলিলেন 'তোমরা উভয়েই আদালতের অবমাননা করছ। পেশ্‌কার, হাতধরে বসাইয়ে দেও'।

মোক্তার (পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া)। ফকিরবাবু! এটা ঠিক কথা কিনা যে আপনি এমন কোনো সর্ত্ত করেন নি যাহাতে আসামী আপনার স্ত্রীর সহিত সুখদুঃখের কথা কহিতে পারিবে না।

ফকির। এমন কোনো সর্ত্ত হয় নাই।

মোক্তার। আপনি যে তিনখানি প্রেমপত্রিকা আদালতে দাখিল করেছেন তাহা পাইলেন কোথায় ?

ফকির। স্ত্রীর বাক্সে।

মোক্তার। আপনার স্ত্রী তাহা জানেন ?

ফকির। না, আমি লুকিয়ে বার করেছি।

মোক্তার। উহা যে আসামীর লেখা তাহার প্রমাণ কি ?

ফকির। আসামীর স্ত্রী তাহার স্বামীর হাতের লেখা প্রমাণ করবে। সেখ্‌জিও জানেন।

মোক্তার। আপনি এই পত্র সম্বন্ধে, আপনার স্ত্রী, আসামীর স্ত্রী, কিংবা অন্য কাহাকেও কোনো কথা বলেছিলেন ?

ফকির। না, কেবল সেখ্‌জিকে দেখিয়েছিলেম, তারপর ফাঁড়িতে দাখিল ক'রে দিই।

৬

প্রথম সাক্ষী শুক্তকড়ি বাগ্দী। তাহার বর্ণনা এই যে, দুই তিন দিবস প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্নে, বাদীর স্ত্রী আসামীকে সজলনয়নে অনুনয় বিনয়, এবং মধ্যে মধ্যে ভর্ৎসনা করিতেছিল তাহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। তাহাতে বোধ হয়, আসামী কোনো অন্যায় প্রস্তাবনা করিয়াছিল। আসামী বলিয়াছিল 'ক্ষমা কর, যা হবার তা হয়ে গেছে, আমি সংসারে আর থাকবনা'।

জেরা।

মোক্তার। সংসার অনিত্য তাহা তুমি জান ?

শুক্তকড়ি। সেটা তো নিত্যই ভেবে থাকি।

মোক্তার। তুমি চুরির মোকদ্দমায় সাজা পেয়েছিলে ?

শুক্তকড়ি। সংসার যখন অনিত্য, তখন চুরিও অনিত্য।

মোক্তার। জেলে গিয়েছিলে ?

শূন্যকড়ি। সেটা ঠিক স্মরণ হয় না। বোধ হয় আপীলে খালাস পেয়েছিলেম।

মোক্তার। তোমার নাম শূন্যকড়ি কেন?

শূন্যকড়ি। আগে নাম ছিল এককড়ি। হাতে একপয়সাও থাকেনা, তাই আমার স্ত্রী পরে নাম রেখেছে শূন্যকড়ি।

মোক্তার। তোমার স্ত্রী বাদীর শ্বশুরবাড়ীতে বাসন মাজে?

শূন্যকড়ি। আপনি সেই কাপড়চুরির কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন? আমার স্ত্রী কখনো তা চুরি করে নাই।

মোক্তার। তবে কে করেছিল?

শূন্যকড়ি। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রবেন।

শূন্যকড়ির স্ত্রী ভীমাদাসী এজাহারে বলিল যে, জানালার ফাঁক দিয়া সে ও তাহার স্বামী বাদীর স্ত্রীকে রোষযুক্ত নয়নে তাকাইতে দেখিয়াছিল।



জেরা—

মোক্তার। তোমার স্বামী বলে যে কাপড়-চুরির কথা তুমিই জান।

ভীমা। সে মিথ্যাবাদী। সেই চোর।

মোক্তার। রোষযুক্ত নয়ন বুঝিলে কেমন ক'রে?

ভীমা। রোষের ভাব আমরা যত বুঝি তোমরা কি তা বোঝ? শুধু, তাই নয়, মধুঠাকরুণ রেগে বলছিল 'তুমি বিশ্বাসঘাতক', এটা কি সোজা কথা?

কোর্টবাবু। (আদালতের প্রতি) হুজুর, কথাটা টুকিয়া লউন।

হাকিম। লওয়া হইয়াছে। (সাক্ষীর প্রতি) তুমি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা কি তা জান?

ভীমা। তা আর জানিনে? আমার স্বামী চিরকালই একটা বিশ্বাসঘাতক।



শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

গঙ্গারঘাটে

হাকিম। তার প্রতিকার কি ?

ভীমা। কেবল প্রহার।

৭

সেখ্ জি তৃতীয় সাক্ষী। তিনি নেমাজ পাঠ করিতে বাহিরে গিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া এজেহার দিতে আসিলেন।

এজাহারে বলিলেন—আমার নাম জমিরুদ্দি সেখ। পিতার নাম্ নাসিরুদ্দি সেখ। তাঁহার কোনো পূর্ব্বপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের সময় বাংলাদেশে আসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কমিয়া গেলে আর কোনো পূর্ব্বপুরুষ মুসলমান ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি তিনবার নেমাজ পাঠ করেন এবং সত্য কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই কহেন না। বাদী একদিন বৈকালে তাঁহার নিকট তিনখণ্ড প্রেম পত্রিকা লইয়া আসিয়াছিল, ইহা ছাড়া আর কিছু জানেন না।

কোর্টবাবু বাদীর সহিত পরামর্শ করিয়া আদালতে নিবেদন করিলেন যে সাক্ষী 'হষ্টাইল' অতএব তিনি তাঁহাকে জেরা করিবেন। আদালত অনুজ্ঞা প্রদান করাতে জেরা আরম্ভ হইল।

কোর্টবাবু। আপনি বাদীকে বলেছিলেন 'যে স্বচক্ষে এবং স্বকর্ণে আসামীকে বাদীর স্ত্রীর নিকট 'আরজু', 'মিনতি,' কর্ত্তে দেখেছেন ও শুনেছেন।

সেখ্ জি। তা বলেছি। সেটা হয় ত সত্য কিংবা মিথ্যা।

কোর্টবাবু। আপনি সত্য কথা বলিবেন ইহা কড়ার করিয়া কুড়ি টাকা ফুরাণ করেন!

সেখ্ জি। তার মধ্যে পেয়েছি মাত্র দশ টাকা, কাজেই সত্য কথার অর্দ্ধেক বলেছি।

কোর্টবাবু। বাকি দশটাকা দিলে সম্পূর্ণ সত্যকথা বলিবেন ?

সেখ্ জি। নিশ্চয়।

আদালত। এটা কি ন্যায়-সঙ্গত ?

সেখ্ জি। হুজুর, পরিশ্রমের মূল্য আছে। আমি তিনদিন যাবৎ কষ্টকরে ঐ গাছের নীচে ব'সে ব'সে বৃষ্টির জলে ভিজেছি। যে রকম দিন হয়েছে, সত্যকথার মূল্য নাই। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে সকলে টাকা নেয়, আমি সত্য সাক্ষ্য দিয়ে অনাহারে থাকব এটা কি ধর্ম্ম ?

আদালত। আচ্ছা, এ যাত্রা বাকি সত্যটুকু ধর্ম্মের খাতিরে 'গ্রেটিস্' ব'লে ফেলুন।

সেখ্ জি। তবে বলি। এই যে বাদী ফকির ঘোষ একটা 'ম্যাড়াকান্ত' রকম লোক। ওর স্ত্রী মধুমতী সতী সাবিত্তিরি। আসামীর মতন সৎলোকও দুনিয়াতে দেখা যায় না। আসল কথা যতদূর বুঝা গেল, ঐ চিঠির মধ্যে যা কিছু গোলযোগ আছে তাহা বাদী ও আসামীর স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেই মিটে যাবে। বাদীর পিসীকে ডেকেও জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারেন।

কোর্টবাবুর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আদালত উভয় পক্ষের সহধর্ম্মিণীকে সমন করিলেন।

মালতী দাসীর এজেহারে প্রকাশ পাইল যে তাহার স্বামী ঠিক সময়ে সেদিন ভাত না পাইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল, এবং তাহাতে সে আত্মহত্যা সঙ্কল্প করিয়া স্বামীকে পত্র লেখে, তাহাতে তাহার স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া মেদিনীপুরে চলিয়া যায়।

মোক্তার। আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন ?

মালতী। তিনখানা পত্র লিখেছিলেন।

মোক্তার। সেগুলি কার কাছে ছিল ?

মালতী। মধুদিদি সে ক'খানা চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন জোর ক'রে। (তিনখণ্ড পত্র সেনাক্ত)

মোক্তার। আপনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ?

মালতী। তিনি চলে যাওয়াতে করি নাই, কেননা তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করবার ইচ্ছা ছিল।

শেষ সাক্ষী—মধুমতী।

আদালত। আপনি এ তিনখানি পত্র কোথায় পান ?

মধু। মালতীর কাছে।

আদালত। এ সম্বন্ধে আসামীকে কিছু বলেন ?

মধু। অনেক বুঝিয়েছি, অনেক মিনতিও করেছি, ভর্ৎসনাও করেছি, কিন্তু কোনো কথা না শুনে সে চলে গেল।

আদালত। আপনি তাহাকে বিশ্বাসঘাতক বলেছিলেন ?

মধু। তাও বলেছিলেম। স্ত্রীকে ছেড়ে যে চলে যায় সে নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক।

আদালত। তা'হলে আপনার স্বামী যে আপনাকে ছেড়ে বিদেশে গিয়েছিলেন, তিনিও বিশ্বাসঘাতক।

মধু। তার সন্দেহ নাই। ছয়মাস কেটে গেল তিনি নিয়ে গেলেন না, সেজন্য আমি তাঁকে আর পত্র লিখিনি।

কোর্টবাবুর জেরা। আপনি ত স্বামীর জন্য বিশেষ কিছু ভাবেন নি, বরং আহারের মাত্রাও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মধু। তা যদি বলেন, আজাকালকার স্বামী, চেহারা একটু খারাপ দেখলে একবার তাকিয়েও জিজ্ঞাসা করে না। সেজন্য আমাকে সমানে সাবান মাখতে হয়েছে।

খুব বুদ্ধিমতী স্ত্রী। কি বল পেশকার ?

পেশকার—আজ্ঞে, অনেকটা—

আদালত। আমার সহধর্ম্মিণীর মতো ? (হাস্য)

পেশকার। সে কথা বলিতে সাহস হয় না—তবে আমার তিনি অনেকটা বোধ হয় সেই রকম। (সকলের হাস্য)

৯

হাকিম দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন 'বোধ হয় বৃথা সময় নষ্ট করিয়া রায় দেওয়ার আবশ্যক নাই, আমি এ মামলার রায় মুখে বলিয়া যাইতেছি, তোমরা টুকিয়া লও। পরে পাকা রায় দেওয়া যাইবেক।'

রায়

এই মোকদ্দমার বিশেষত্ব এই যে ইহার অভিনেতা ও সাক্ষী সকলেই নিরেট্ বেয়াকুব। প্রথমতঃ বাদী ফকিরচন্দ্র ঘোষ বেয়াকুব, কারণ সে তার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করে। যাহারা স্ত্রীকে সন্দেহ করে তাহাদের মনুষ্যত্ব নাই, কারণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেই সকলে বুঝে যে সংসার মায়াময়, এবং স্ত্রীলোক এবং সংসার এবং সম্পত্তি সকলই মায়াময় পদার্থও একই রকমের। এ সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও, কাহারও হস্তে ন্যস্ত করা বেয়াকুবি, এবং তাহা লইয়া মামলা করা আরও বেয়াকুবি। প্রেমও একটা মায়াবিশেষ, ইহার মধ্যে বৈধ কোনটা ও অবৈধ (অবধ্য) কোন্‌টা তাহা সমাজ এখনও নির্ণয় করিতে পারি নাই। স্ত্রী বরঞ্চ স্বামীকে অবিশ্বাস করিতে পারে, কারণ আমরা ঈশ্বরকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিনা। দ্বিতীয় বেয়াকুব জমাদার সাহেব, এবং তৃতীয় দারোগা মহাশয়। ফৌজদারী আইন, স্ত্রী-সম্পত্তি এবং প্রেমকে বাতিল করিয়া দিয়াছে। পুলিশ কর্ম্মচারীবর্গের সেটা মনে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দারোগা মহাশয়ের যদি সন্দেহ হইয়াছিল তখন প্রথমেই উভয়পক্ষের সহধর্ম্মিণীর এজেহার লওয়া উচিত ছিল, এবং এসম্বন্ধে 'এক্সপার্ট' স্ত্রীলোকদের মত লইতে পারিতেন।

সাক্ষীগণও বেয়াকুব, যদিও তাহারা সত্যকথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেখ্ জির এজাহারের প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য।

অবশেষে সকলেরই উচিত পরস্পরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। আসামীর জবাব লওয়া আবশ্যকীয় নহে, সে ২৫৩ ধারায় বেকসুর খালাস পাইল।

আদালতের রায় উচ্চারিত হইয়া গেলে বাদী আসামীর ক্ষমা প্রর্থনা করিল। আসামী তার স্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহা দেখিয়া বাদীও তাহার স্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং কোর্টবাবু মোক্তার মহাশয়ের ক্ষমা প্রর্থনা করিলেন। শুষ্ককড়ি বাগদী ভীমার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। স্ত্রীগণ ক্ষমার পরিবর্ত্তে নয়নে অঞ্চল প্রদান করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিল। বাদী পেশকার মহাশয়কে খুসী করিয়া দিল। সকলেই স্বীকার করিল যে প্রলয় (প্রণয়) কখনো অবৈধ (অবধ্য) হইতে পারেনা, কারণ তাহা সর্ব্বদাই পবিত্র।

কত যে বেসেছি ভাল

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

১

কত যে বেসেছি ভালো, ভালো করে বুঝি,
যখন সময় হ'ল চলিয়া যাবার,
শিশুকাল হ'তে সারা জীবনের পুঁজি,
সবে অবসর হয় দেখিতে পাবার !

২

রাতের জোছনা আর দিনের আলোক,
বাতাসের পরশন, ফুলের সুবাস,
রামধনু রংয়ে-ধোয়া পাখীর পালক ;
কি রং বুলাল মোর মনে বারোমাস !

৩

পাখীর প্রভাতী সুর, সাঁঝের বৈকালী,
নিশির শিশিরে ভেজা সন্ধ্যামণি ফুল,
বারে বারে ফিরে আসা বসন্তের ডালি,
অশোক পারুল চাঁপা পলাশ শিমূল !

৪

জোছনা জমাট বাঁধা কেয়ার পরাগ,
মুদিত মায়ের মন কমল কোরক,
কোলে আসে নাই ছেলে, ভোলা-অনুরাগ ;
পদ্মপাতে টলটলে হাসির হীরক !

৫

মদগন্ধে মেতে ওঠা বেপথু-বকুল,
ঝরে মধু-বিন্দুসম ধরার উরসে,
বর্ষাসিক্ত অবনীর শ্যামল দুকূল,
মাটীর সৌরভে ভরে দিগন্ত হরষে !

৬

বরষার এলোচুল ছায় কালো মেয়ে,
হাতের কঙ্কণে খেলে চঞ্চলা দামিনী,
কে এসে ফিরিয়া যায় পরশন মেগে ?
বিরহ শয়নে কাঁদে সারাটি যামিনী ?

৭

শরতের নীলাকাশ নিঃশেষে নির্মল,
রুচিরা শুচিতা সব আবরণ খোলা,
মেলি শতদল ধীরে হাসে নীলোৎপল,
পরিমল মগ্ন মন অনিমেষ ভোলা !

৮

কত মুগ্ধ অভিসার মিলনের মেলা,
পরাণের পথে পথে পথে নবনব গাথা,
কত পূর্ণা রাসবাতি, ফুলদোল-খেলা,
কত দীপ, ধূপবাস কত মালা গাঁথা !



কাশ্মীরের স্বাভাবিক দৃশ্য

শিল্পী—এস. জি. ঠাকুরসিং

সেবার পুরস্কার

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

১

"শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী—"

মেঘমালিপ্ত প্রভাতের আকাশপথে পাগল হারুর গান গ্রামে গ্রামে উঠিয়া শ্মশানের বৈরাগ্যকে যেন মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছিল। এই পবিত্র তীর্থে—মানবদেহের চরম সমাপ্তির মহাশ্মশানে আজ বিশ বৎসর ধরিয়া বহুযাত্রীকে বহন করিয়া আনিয়াছি। পাগল হারু কতকাল ধরিয়া এখানে রহিয়াছে জানিনা, বিশ বৎসর আমিই তাহাকে দেখিতেছি। সে আপন খেয়ালেই সর্ব্বদা মগ্ন থাকিত, যখন খুসী হইত সে আপন মনে গান গাহিত; কিন্তু কখনও একটা পুরা গান তাহাকে সমাপ্ত করিতে শুনি নাই। ফরমাস করিয়াও কেহ তাহাকে কখনও গান করাইতে পারে নাই।

রাত্রিশেষে একজন পরপারযাত্রীকে আমরা বহন করিয়া আনিয়াছিলাম। বিংশশতাব্দীর সভ্যতালোকদীপ্ত বাঙ্গালী সমাজে এই আরাম-বিরোধী কাজটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইলেও, কৈশোর হইতে এই কার্য্যটির ভার কেমন করিয়া যে আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহার কারণ আজিও আবিষ্কার করিতে পারি নাই। আমার একটা পিতৃদত্ত নাম ছিল এবং এখনও আছে; কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে 'চিত্রগুপ্ত' বলিয়াই ডাকিয়া থাকেন। আমি নিজে কখনও হিসাব করিয়া দেখি নাই, তবে যাঁহারা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমার জীবনের খুটিনাটি বিষয়েরও সন্ধান রাখেন, তাঁহারা নাকি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, অন্ততঃ সহস্র নরনারীর পরপারের যাত্রার আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছি এবং সেই কারণেই কল্পলোকবাসী মহাপুরুষের নামটি তাঁহারা আমাকে পুরস্কারস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন।

চিতার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে তখনও বিলম্ব আছে দেখিয়া আমি সুহৃদ্বর শ্মশান দারোগার ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতেছিলাম; আমার সহযোগী বন্ধুরা চিতার পার্শ্বে ছিলেন, শেষ কর্ত্তব্যগুলি তাঁহারাই সম্পন্ন করিতে পারিবেন বলিয়া আমাকে একটু রেহাই দিয়াছিলেন।

দেশবন্ধুর দেহাবশেষ কয়েকদিন পূর্ব্বে এই মহাশ্মশানেই ভস্মীভূত হইয়াছিল। সেই পুণ্য-কথারই আলোচনা চলিতেছিল। জনৈক মার্কিণ ভদ্রলোক দুইদিন পূর্ব্বে এই পুণ্যতীর্থে আসিয়া যেখানে দেশবন্ধুর চিতা সজ্জিত হইয়াছিল তাহা দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং সেইখানে টুপী খুলিয়া নতজানু হইয়া ত্যাগী দেশপ্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধহৃদয়ে

সেই গল্প শুনিতেছিলাম, এমন সময় দ্রুতপদে একজন ভদ্রলোক বারাণ্ডায় উঠিয়া বলিলেন, "মশাই, এখানে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় ?"

প্রশ্নটার বৈচিত্র্যে আমরা দুইজনই নবাগতের দিকে চাহিলাম।

ভদ্রলোক সম্ভবতঃ আমাদের মুখে বিস্ময়রেখা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "জন পাঁচ ছয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হলেই চল্‌তে পারে। আপনাদের সন্ধানে আছে কি ?"

দারোগাবাবু বলিলেন, "কি দরকার বলুন ত ?"

আগন্তুক বলিলেন, "একজন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়েছে। তিনি রাঢ়ী, ব্রাহ্মণের শব যা তা করে ত দাহ করা যায় না। তা এতে যা খরচপত্র হবে সেজন্য ভাব্‌না নেই। আপনারা যোগাড় করে দিতে পারেন ?"

আমি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম। এখন আর পারিলাম না। বলিলাম "এসব কাজে পয়সা দিয়ে আপনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পাবেন বলে ত মনে হয় না।"

আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "তাইত দেখ্‌ছি। আমি আরও দুই এক জায়গায় একটু আগে প্রস্তাব করেছিলুম। কোন ফল হয়নি। তবেই ত, ভারী মুস্কিল হ'ল দেখ্‌ছি! ব্রাহ্মণের শব!—বড়ই বিপদ!"

আমি বলিলাম, "লোকটি কে মশাই, বল্‌তে আপত্তি আছে কি ?"

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরে বলিলেন, "লোকটির কোন আত্মীয়স্বজন এদেশে নেই। কোন ভদ্রঘরে ৪০ বছর ধরে রাঁধুনী বামুনের কাজ করে এসেছে। শুধু ৮ বছরের একটি ছোট ছেলে আছে। এখন দাহ করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।"

আমার কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল। ৪০ বৎসর একাদিক্রমে যে বাড়ীতে এই ব্রাহ্মণ সূপকারের কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহার অন্তিমকালের কাজ করিবার জন্য বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-সমাজে লোক পাওয়া যাইতেছে না!

"দেখুন মশাই, টাকা দিয়ে আপনি লোক পাবেন না। তবে যদি সব কথা প্রকাশ করতে আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে হয় ত আমি লোক যোগাড় করে দিতে পারি।"

দারোগাবাবু আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি আমার প্রকৃতির পরিচয় ভালরূপেই জানিতেন। নবাগত ভদ্রলোকটিও বিশেষভাবে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলেন।

আমি আবার বলিলাম, "স্পষ্ট করে সব কথা খুলে বলুন, আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন, আর কার বাড়ীতে এই ব্রাহ্মণসন্তান এতদিন কাজ করেছিলেন।"

ভদ্রলোক যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন সকল কথা না বলিলে লোকের যোগাড় হইবে না; তখন তিনি বলিলেন যে, চৌরঙ্গীর সন্নিহিত কোনও বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ পল্লীর নিকটেই বাঙ্গালার এক জমীদারভবনেই এই ব্রাহ্মণ এতদিন চাকরী করিয়াছিল।

নানাকার্য্যের অজুহতে সে পল্লীর এবং নিকটবর্ত্তীস্থানের প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর অনুসন্ধান

আমি রাখিতাম। ভদ্রলোক যে পল্লীর নাম করিলেন, সেখানে মাত্র একঘর বাঙ্গালীরই বাসভবন আছে। বাড়ীর মালিকদিগের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার পরিচয় না থাকিলেও আমি জানিতাম, বাঙ্গালার কোনও বিশিষ্টব্রাহ্মণ জমীদারবংশকে তাঁহারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বলিলাম, "বলেন কি, মশাই! আপনি যে পরিচয় দিলেন, তাতে ব্রাহ্মণসমাজের একজন চূড়ামণির ঘরেই এই মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা মস্ত ধনী ও সম্ভ্রান্তলোক। তাঁদের বাড়ীতে শবের সৎকার করার লোক পেলেন না?"

আগন্তুক অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "লোক তাঁদের ওখানে বেশী নেই। বড়বাবু আর তাঁর ছেলেমেয়েরা ছাড়া আর কেউ নেই। আমরা কর্ম্মচারীরা আছি বটে, কিন্তু আমরা ত ব্রাহ্মণ নই। বাবু বলে দিয়েছেন, খরচ যা লাগে সব তিনিই দেবেন।"

লোকটি একবার করুণদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল।

২

সংকল্প স্থিরই করিয়াছিলাম, তবে সহকর্ম্মীদিগের মতটা একবার জানা দরকার। ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া শ্মশানচত্বরে প্রবেশ করিলাম। আমাদের চিতার অগ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, তবে বেশী বিলম্বও ছিলনা।

মামাকে সব কথা বলিলাম। তিনি আমাদের চাঁই ছিলেন। সত্যকথা বলিতে কি, আমার এই মামার জীবনের আদর্শ হইতেই আমি এই কাজটির জন্য প্রেরণা পাইতাম। মামা প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না; কিন্তু যখন ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলাম, ব্রাহ্মণের অভাবে, শবদাহের অনুরূপ ব্যবস্থাও যদি ঘটে তাহাতে জ্ঞানকৃত একটা অনুশোচনা হইতে কি আমরা অব্যাহতি পাইব? বিশেষতঃ কয়দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী দেশবন্ধুর শববহন ও অনুগমনে যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে, একজন নগণ্য ব্রাহ্মণের শবদেহের সৎকার যদি তাহাদের দুইচারিজনের মনেও কোন সহানুভূতির প্রকাশ না ঘটে তবে এখন কেহ না জানিলেও পরিণামে ভগবানের দরবারে কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারিব কি?

সারারজনীর অনিদ্রা ও পরিশ্রমে আমাদের শরীর ক্লান্ত হইলেও কার্য্যটির ভার লইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইলাম। কর্ম্মচারী ভদ্রলোকটিকে সে সংবাদ জানাইলাম। তবে চিতার শেষ-কাজগুলি সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভদ্রলোক, আমাদিগকে সম্মত হইতে দেখিয়া যেন পরম নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি বিনীতভাবে জানাইলেন যে, আমরা যেন গাড়ী করিয়া যাই, তাহাতে শীঘ্র পৌছান যাইবেও বটে এবং একবার পথশ্রমের লাঘবও হইবে। আপাততঃ অন্যান্য বিষয় সংগ্রহ ও বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি এখনই চলিয়া যাইতে চাহিলেন।

ঠিকানা আমার জানা ছিল, সুতরাং তাঁহাকে আমাদের প্রয়োজন ছিলনা। ভদ্রলোক পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

আমরা তখন চিতার কাজ শেষ করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহ দেখাইতে লাগিলাম। বেলা ৭টা বাজিয়া গিয়াছে। আর একজনকে পরপারের ঘাটে পৌছাইয়া দিতে হইবে!

চিতা নিভাইয়া দিয়া, গঙ্গার জলে হাতমুখ ধুইয়া, আমরা ছয়মূর্ত্তি যখন শ্মশান হইতে বাহির হইতেছি, সেই সময় পাগ্‌লা হাক গাহিয়া উঠিল—"সংসারে সং সাজা!"

মামা রসিক লোক। তিনি বলিলেন, "পাগ্‌লাটার রসবোধ আছে, যোগেন!"

আমি একটু হাসিলাম। কথাটা মিথ্যা নহে।

বন্ধুবর হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "যোগেনের পাল্লায় পড়ে আরও কত সং সাজতে হবে, তাই বা কে জানে!"

আমি বলিলাম, "সাজ্‌তে হবে, কি সং সাজা দেখ্‌তে হবে, কে বল্‌তে পারে?"

৩

সুদৃশ্য ফটকের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ী যখন নির্দ্দিষ্ট জমীদার বাটীর প্রাঙ্গণে থামিল, তখন রৌদ্রের আলোকে চারিদিক ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। নিঃশব্দে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া অগ্রসর হইলাম।

কতিপয় সুসজ্জিত, ভদ্রবেশধারী যুবক ও অর্দ্ধবয়স্ককে বাড়ীর ইতস্ততঃ গতায়াত করিতে দেখিলাম। তাঁহারা যে সকলেই জমীদারের কর্ম্মচারী, ভাবভঙ্গীতে তাহা বুঝা গেল না। লোকগুলি আমাদিগকে দেখিয়াও যেন দেখিলেন না।

মাতুলমহাশয় রসিকলোক হইলেও সহজেই চটিয়া যান। আমরা এই বাড়ীর কোনও ব্রাহ্মণের শবসৎকারের জন্য উপযাচক হইয়া আসিয়াছি, অথচ লোকগুলি সে সম্বন্ধে আদৌ উৎসাহী নহে, এদৃশ্যে তাঁহার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিবারই কথা।

সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত বারাণ্ডায় আমরা দাঁড়াইবার পর একজন লোক—ভাবে বোধ হইল সে এখানকার কোন কর্ম্মচারী—আমাদের কাছে আসিলেন। আমি সংক্ষেপে সকল কথা বলিবামাত্র সে শবদেহ কোথায় আছে তাহা দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইল। গাড়োয়ান ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সে তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া আসিল।

যে ভদ্রলোক আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কর্ম্মচারীকে তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। লোকটি 'আম্‌তা' 'আম্‌তা' করিয়া যাহা বলিল তাহা হইতে বুঝা গেল, তিনি উপস্থিত নাই, কার্য্যান্তরে গিয়াছেন। তবে শবের সৎকারের জন্য বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি নাই।

সম্মুখের প্রশস্ত বৈঠকখানাঘরে কয়েকজন বাবু প্রাভাতিক চাপানে ব্যস্ত হইতেছিলেন দেখিলাম।

কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম, বাড়ীর কর্ত্তাবাবু উঁহাদের মধ্যে নাই বটে, তবে বাবুবেশী যুবকগণ সকলেই এই বাড়ীর আত্মীয়—কেহ বা ভাগিনেয়, কেহ বা আর কিছু।

আমাদের পিত্ত যে ক্রমেই জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু স্বেচ্ছায় যে কার্য্যের ভার লইয়া আসিয়াছি, তাহাতে বিমুখ হইলে ত মনুষ্যত্ব থাকিবে না।

কর্ম্মচারীর সঙ্গে নির্দ্দিষ্টগৃহে প্রবেশ করিলাম। একটি বড় টেব্‌লের উপর একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে—শবের উপর একখানা শতছিদ্র মলিন বস্ত্রাবরণ, অদূরে, শতগ্রন্থিযুক্ত—বস্ত্রআখ্যা তাহাকে দেওয়া চলেনা, তবে কোনও সুদূর অতীতে এককালে হয় ত তাহাকে বস্ত্র বলা যাইতে পারিত—একখানি বস্ত্রাংশবিজড়িত এক রোরুদ্যমান বালক মাটীতে বসিয়া আছে। তাহার আননে শঙ্কা ও শোকের এক করুণ চিত্র!

মৃত্যুস্তব্ধ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রও যেন স্তব্ধ হইয়া আসিল। বালক ব্যাকুলভাবে একবার আমাদের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি আমাদের প্রত্যেককেই যেন বিদ্ধ করিল।

আমি কর্ম্মচারীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই ব্রাহ্মণ কি এই বাড়ীতে ৪০ বৎসর চাকরী করেছিলেন?"

সে নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া সেকথার যাথার্থ্য স্বীকার করিল। পাশের ঘরে সঞ্চরণমান যুবক আত্মীয়দিগের পদশব্দ—আমাদের কাণে আসিতেছিল।

গৃহের একদিকে মলিন, দুর্গন্ধ-পূর্ণ কন্থা, তোষক, বালিশ প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে। অন্তঃপুর হইতে নারীকণ্ঠের আদেশ কাণে আসিল, "ছোঁড়াটাকে দিয়ে বিছানা টিছানা গুলো বাইরে ফেলিয়া দেও।"

আট বৎসরের বালক ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশক্রমে সে একে একে অতিকষ্টে, মৃতের ব্যবহৃত শয্যা তুলিয়া লইয়া কোনক্রমে রাজপথের পার্শ্বে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

স্তব্ধভাবে আমরা ছয়জন সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

৪০ বৎসর ধরিয়া পরিচর্য্যার পুরস্কার বটে।

কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলাম, "বাড়ীর কর্ত্তাকে একবার সংবাদ দিন, আমরা দেখা করে যেতে চাই।"

লোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাঁর সঙ্গে এখনত দেখা হবে না। তিনি ঘুমুচ্ছেন।"

"এখনও ঘুমুচ্ছেন! তবু আপনি একবার খবর দিন না।"

"না, মশাই, সে ক্ষমতা আমাদের নেই। বেলা ১০টার আগে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন না। তাঁকে ডাকা নিষেধ।"

ধৈর্য্যের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিতেছিল, তথাপি কষ্টে কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া

বলিলাম, "বলেন কি? বাড়ীতে মড়া রয়েছে, আজও বেলা ১০টা না বাজলে তাঁর ঘুম ভাঙ্গবে না? আশ্চর্য্য।"

মাতুল মহাশয় যথার্থই চাণক্যের বংশধর। তিনি একটু চড়া গলাতে বলিয়া উঠিলেন "বড়লোক হ'লে কি হয়, দেখ্‌ছ না কি রকম চামার! চল, আমরা যে কাজ কর্‌তে এসেছি করে যাই। এখনকার বাতাসেও বিষ আছে।"

হরেন্দ্র বলিল, "সেই ভাল। চামারের সংস্রব থেকে যত শীঘ্র সরে পড়া যায়, সেটাই মঙ্গল।"

আমাদের এ আলোচনা চা-সেবনরত বাবুবৃন্দের শ্রবণবিবরে নিশ্চয় প্রবেশ করিতেছিল। কর্ম্মচারীটি হেঁটমুণ্ডে দাঁড়াইয়া।

শব বহনের ব্যবস্থা করিয়া কর্ম্মচারীটিকে বুঝাইয়া দিলাম, আমরা শ্মশানে বেশী বিলম্ব করিতে পারিব না। বালক অবশ্যই তাহার পিতার মুখাগ্নি করিবে। তাহাকে ফিরাইয়া আনা ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য এখানকার কাহাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে।

কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে চলিল।

বাড়ীর বাবুরা সযত্নে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে দূরেই রহিলেন বুঝিলাম।

চিতা জ্বলিয়া উঠিল। রোরুদ্যমান বালক পিতার মুখাগ্নি করিল।

যেমন করিয়াই হউক বালকের কাহিনী শ্মশানে রটিয়া গিয়াছিল। উপস্থিত সকলেই তাহার অবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল। এমন কি যে ডোম কাঠ আনিয়া দিতেছিল সেও বালকের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য উপযাচকভাবে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেছিল।

চিতা নিভিবার কোনও আশঙ্কা নাই দেখিয়া আমরা শ্মশান ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। কর্ম্মচারীটি তখন সবিনয়ে জানাইল যে, আমরা কিছু জলযোগ করিলে সে কৃতার্থ হইবে। তাহার প্রতি তাহার মনিবের এইরূপ আদেশ আছে।

মাতুল কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই ব্রাহ্মণের সৎকারের জন্য যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহা ব্রাহ্মণের প্রাপ্য বেতন হইতে বাদ যাইবে কিনা।

কর্ম্মচারী তাহার সদুত্তর দিতে পারিল না। তবে সরকারে যে ব্রাহ্মণের বেতন প্রাপ্য আছে এ কথা অস্বীকার করিতেও পারিল না।

আমি বলিলাম, "আমাদের জলযোগের জন্য আপনি কতটাকা ব্যয় কর্‌তে পারেন?"

"তা ঠিক নেই। ৫।৬ টাকাও আমি দিতে পারি।"

"এই বালকের পরণে কি আছে দেখছেন! এর কাপড় কিন্‌বার জন্য আপনার প্রতি আদেশ আছে?"

মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে কর্ম্মচারী বলিল, "আজ্ঞে, সে রকম হুকুম আমার উপর নেই!"

"আপনার মনিবকে জানাবেন, আমরা তাঁর মত জমিদার না হ'লেও ভদ্রসন্তান এবং ব্রাহ্মণ। তিনি হিন্দুসমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয়। শুধু ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখবার জন্যই আমরা একাজ করেছি। তাঁর অর্থের বা খাবারের আশায় নয়।"

ক্ষোভে ও ক্রোধে সত্যই আমি সংযম হারাইতেছিলাম। আর যাহা বলিবার ছিল তাহা প্রকাশ করিলাম না।

সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহার কাছে কি আছে। আমাদের ছয়জনের কাছে যাহা ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া দাঁড়াইল ৪৷৵০ আনা। স্থির করিলাম বালকের 'কাছা' ও উত্তরীয় ক্রয় করিয়া আরও কিছু উদ্বৃত্ত হইবে। বালকের ব্যবহারের জন্য একজোড়া কাপড় কিনিয়া দিতে হইবে।

পাগলা হারু যে কখন চিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করি নাই। সে ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কোমরের বস্ত্রবন্ধন খুলিয়া ফেলিল। অঞ্চলের এক কোণ হইতে সে কি খুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিল। দেখিলাম একটি টাকা!

সে আর দাঁড়াইল না হন্ হন্ করিয়া শ্মশানের বাহিরে চলিয়া গেল। শত ডাকাতেও সে ফিরিয়া চাহিল না।

শ্মশান শুদ্ধ লোক অবাক-বিস্ময়ে ভিখারী পাগলা হারুর গতিশীল মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। অমন যে কঠোর হৃদয় মাতুল, দেখিলাম নিঃশব্দে তিনিও হস্তদ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছেন।

আমার বুকের মধ্যে তখন কি হইতেছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার মত শক্তি আমার নাই।

জমিদারের কর্ম্মচারীটি অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া বোধ হয় ভূমির বক্ষে ফাটল অনুসন্ধান করিতেছিল।

কর্ম্মচারীর নিকটে গিয়া বলিলাম, "আপনার মনিবকে বল্‌বেন, ৪০ বৎসর তাঁর সেবা করে যে লোকটি চলে গেল, তার ছেলেটির প্রতি যেন তিনি একটু কৃপা-দৃষ্টি রাখেন। আমি জানি তাঁহারই কোন পূর্ব্বপুরুষ, ভাণ্ডারী চাকরের মৃত্যুর পর তার সংসার প্রতিপালনের জন্য ২০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। সেই মহাপুরুষের বংশধর, আজীবন পরিচর্য্যা-রত ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে আজ যেন ভাসিয়ে না দেন।"

লোকটী তেমনই নতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দূর হইতে পাগলা হারুর কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। সে গাহিতেছিল—

"শ্মশান ভাল বাসিস শ্যামা—"

উপহার

শ্রীলীলাদেবী

ফুলে ফুলে ভরা আসে চিঠি
দিকে দিকে ধরা পড়ে দিঠি
এতটুকু ফাঁক নাই তার
সরোবরে গেঁথে রাখো মালা
সৈকতে মুক্তার বালা
পাঠাও যে কত উপহার!
কূলে কূলে জোড়া অনুরাগ
শাখে শাখে তোড়ার সোহাগ
কিশলয়ে ইসারা দোলায়
নির্ঝরে হীরা হার চূড়
গিরি বনে কেয়ূর নূপুর
মণি চুনি মনঃশিলায়
ঝ'রে পড়ে তাদের অমিয়
বরষায় ওগো রমণীয়!
কেয়া বাস চাদর উড়ায়!
রাতে রাতে গভীর যতন
আঁখি পাতে আনে যে স্বপন
কান্নায় হৃদয় জুড়ায়!
মাঠে মাঠে রেখে দাও স্মৃতি
ঘাটে বাটে এঁকে যাও প্রীতি
ছড়াও যে তৃষা পথময়
কোরকেতে বেঁধে যাও আশা
সেধে নাও সব ভালবাসা
কোকিলেতে গলা ক'রে লয়!



দাক্ষিণাত্যের ঋষি ব্যাঘ্রপাদস্বামী
অধিকারী Mr. C. W. E. Cotton I. C. S. C. I. E.
মহোদয়ের সৌজন্যে।

সব সাধ যদি মিটিত প্রায়—



দরিদ্র, দুর্ব্বল আর নগণ্য হইয়া
কি ফল হইবে বল, জগতে বাঁচিয়া

ভীমসেন মত শক্তি লভিতে পারিলে
দুই হাতে ভেঙে ফেলি বৃক্ষ অবহেলে



গায়ের জোরে এ বাজারে দুনিয়া করা মাৎ
যায় না'ক দুঃখ বড়—হায় রে বরাৎ !
কবি হব, কবি হব, সাধ জাগে মনে
গাদা গাদা কাব্য লিখি গুড়গুড়ি টেনে।

সব সাধ যদি মিটিত ধরায়—



কবি হয়ে লাভ কিবা অন্ন নাহি জোটে
আশা কুহকিনী হেসে বলে 'বটে, বটে—
দারিদ্র্যেতে বড় জ্বালা—তাই খুঁজি গুপ্তধন
সাত কলসী মোহর যদি পাই রে এখন



টাকা হল আশা কিন্তু মিটিল না হায়,
প্রতিষ্ঠা, মান, মর্য্যাদা চাই, নয়ত সব যায়—

আশা বলে তাই দিনু—করহ আরাম
পথেতে যাইতে দেখি দুধারে সেলাম।

সব সাধ যদি মিটিত



বাড়ীতে আসিনু ফিরে ক্লান্ত অতিশয়
ঢেলে দিনু শ্রান্ত তনু কোমল শয্যায়
ভৃত্য আসি পাখা করে, পদসেবে দাসী
আলবোলা নল মুখে তুলে দেয় আসি



হঠাৎ দেখিনু যেন সুন্দরীর দল
সোহাগেতে ঘেরি মোরে হাসে খল খল
অভিমানে কারো হেরি আঁখি ছল ছল
তবু রূপ-তৃষা মিটিল না—জীবন বিফল !

সব সাধ যদি মিটিত হায়—



সংসারে বিরক্তি এল ভাবিনু মনেতে,
চলিব এবার হতে ধর্ম্মের পথেতে
সব ত্যজি হনু, স্বামী ভেংভেতানন্দ
ভক্ত, ভক্তিমতী ঘেরে করয়ে আনন্দ।

মধু-মাধব

শ্রীরামেন্দু দত্ত

১

এই বসুধার মাধুরী হইয়া মূরতি ধরিলে মাধব মোর!
লয়ে সবটুকু অবনীর সুধা, মিটাইলে ক্ষুধা নবনী-চোর!
সুনীল আকাশে, সাগরের জলে,
সবুজ লতায়, শ্যাম তৃণদলে,
দেখেছি, দেখেছি, শ্যাম-বন্ধু! ও নীল অঙ্গ
বিছানো তোর।
অনিল, সলিল, মৃদু তরঙ্গে আনিল নয়নে
স্বপন-ঘোর!

২

গোধূলি বেলার সোণালি আলোয়, দেখেছি, দেখেছি
মোহন-চূড়া!
হোলি-কুঙ্কুমে লালে লাল করি' খেলিছে
দেখিনু দিগ্বধূরা!
তারি সাথে সাথে ঝুমুর, ঝুমুর,
রভস—অবশ বাজিছে ঘুঙুর!
উৎসব-শেষে কে দিল ছড়ায়ে তব ছায়াপথে
রতন-গুঁড়া?
সে পথে কোথায় চলিলে মাধব, দুলায়ে তোমার
মোহন চূড়া!

৩

আলোকে প্লাবিয়া অমল আকাশ উদিল চন্দ্র,
কিরণ ঢালা;
দুল্ দুল্ দুল্, তব নীল বুকে দুলিয়া উঠিল
রতন-মালা!
বহিল পবন, শিহরিল দেহ,
দিলে শ্যামরায় অমরার স্নেহ,
উপরে চাহিয়া হেরিনু অযুত
স্নেহের নয়ন রয়েছে জ্বালা!
প্রেম-জ্যোছনায়, ক্ষেম-সুষমায়, বিশ্ব-ভুবন
হয়েছে আলা।

৪

সমুখে চাহিয়া হেরি দিগন্তে, কি মধুর আহা,
শান্তি আঁকা,
সারাটি ভুবনে জ্যো'স্না-প্লাবন, বিশাল গগনে
চন্দ্র রাকা!
সান্দ্র তোমার নয়নের আলো
অন্ধ'আঁখির কালিমা মুছালো,
কুস্বপন, কালো, কলুষ, সকলি তব করুণায়
মেলিল পাখা!
তোমার প্রেমের অমিয়া-ধারায় যা'কিছু কঠোর
পড়িল ঢাকা!

৫

নন্দ-দুলাল! সুন্দর প্রভু! বসুন্ধরার দুঃখ হর—
ধূ ধূ বহ্নি'র ভীষণ দহন, নিভায়ে ভুবন শ্যামল কর!
শ্যামল কর এ মরু প্রান্তর,
শ্যামল কর এ দেহ অন্তর
তোমারি মূরতি-মাধুরী মাখায়ে
মানুষের দেহে মাধুরী ভর!
মাধব! মোদের মরতে নামিয়া মঞ্জুলতায়
মূরতি ধর!

৬

মূরতি ধরিয়া রহ সাথে সাথে,
যুগ-যুগান্ত রহগো ভরি—
আমরা আবার অখিল বিশ্বে কোটি ব্রজধাম
রচনা করি!
এই যে সুষমা হেরি দিকে দিকে,
হেরি ত্রিভুবনে, হেরি অনিমিখে,
ই নন্দন-রাখী-বন্ধনে হে গোবিন্দ তোমা'
ফেলেছি ধরি'!
তব বন্দনা গাহে ত্রিভুবন, চাহে ত্রিভুবন
তোমারে, হরি!

'ছোট জেতের' ভালবাসা

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

'শাঁকা সাড়ী চাই গো'—বোষ্টুমদের ছোট্ট মেয়েটি, দিব্যি ফুটফুটে টুকটুকে, প্রতিদিন প্রাতে শাঁখাশাড়ী মিশি মাজন রুলী আলতা মাথায় করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করিয়া বেড়াইত। গ্রামের ইতর, ভদ্র, সকল পল্লীর মেয়েপুরুষ তাহার কচি গলার ফিরির আওয়াজ পাইলেই—তাহার রূপার চুড়ীর, রূপার যশমের ঠুনঠুন শব্দ শুনিলেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইত, তাহার মিশি দেওয়া দাঁতের মধুর হাসিটি উপভোগ করিত, যাহার যাহা আবশ্যক সেইমত মাল সওগাদ করিত, কখনও বা ঘরের মাচার লাউ কুমড়াটা তাহার ডালিতে তুলিয়া দিত, আবার কখনও বা তাহাকে দুই দণ্ড বসাইয়া গুড়মুড়ী খাইতে দিয়া তাহার ঘরের খবর লইত। সে যেন গ্রামের ঘড়ীর কাঁটার মত প্রত্যহ প্রভাতে গ্রামের লোককে সময় জানাইয়া দিয়া যাইত।

ছোট্ট বলিয়া বোষ্টুমদের সৈরভী নিতান্ত শিশুটি ছিল না—সে শক্ত সমর্থ ১৩।১৪ বছরের মেয়েটি ছিল, তাহার অঙ্গ বহিয়া প্রথম যৌবনের লাবণ্য সবেমাত্র তরঙ্গ তুলিয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কবে কোন সুদূর-অতীতে তাহার স্মরণাতীত যুগে কোন এক বৈষ্ণব-নন্দনের সহিত তাহার 'চারিহাত এক' হইয়াছিল, তাহা তাহার মনে নাই,—কবে সৈরভীর মায়ের বড় সাধের জামাতা দুরন্ত বসন্তরোগে জগতের মায়া কাটাইয়া কোন অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছিল, তাহা সৈরভী বলিতে পারে না। সে তাহাদের পল্লীর আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে গাছকোমর বাঁধিয়া ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইত, মা তিরস্কার বা প্রহার করিলে ধুলা ঝাড়িয়া বেসাতির ডালা মাথায় তুলিয়া গ্রামে ফিরি করিতে যাইত।

এমনই প্রত্যহ যায়, এমনই প্রত্যহ মাল বেচিয়া ঘরে পয়সা আনে। কিন্তু বিধাতার ইঙ্গিতে কোনদিন কোন মুহূর্ত্তে কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে, তাহা ত সে জানে না; সে কেন, কে-ই বা জানে! এদিনও সে বাড়ী বাড়ী মাল বেচিয়া ঘরে ফিরিতেছিল। ভদ্দর বাগানের পার্শ্বস্থ নির্জ্জন পথটা দিয়া ষষ্ঠীতলার মাঠে পড়িতে পারিবে, এই আশায় সে ঐ পথেই অগ্রসর হইতেছিল, আর নির্জ্জন পল্লীর ছায়াশীতল শ্যামল পথে মনের আনন্দে গুণগুণস্বরে গান ধরিয়াছিল,—'কালীদহের কূলে কালা জলে নেমেছে!' সদাহাস্যস্ফুরিতাধরা সে, এসময়েও তাহার ফুটফুটে কচিমুখে হাসির রেখা বালারুণের সোণার রেখার মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এ গানের জন্য কতদিন সে মায়ের কাছে কত মার খাইয়াছে, কিন্তু গান ছাড়ে নাই।

হঠাৎ ভদ্দর বাগানের পার্শ্বে উপনীত হইয়াই সে গান ছাড়িয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাসিভরা মুখখানি ব্যথাভরা চিন্তার রেখায় গম্ভীরভাব ধারণ করিল। বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বাগানের মধ্যে সে চাহিয়া দেখিল, পুষ্পিতচম্পকতলে দাঁড়াইয়া একটি গৌরাঙ্গ বালক দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া হাপুসনয়নে কাঁদিতেছে; দেখিয়াই চিনিল, সে মিত্তিরবাবুদের ছেলে হেমন্তকুমার। সে প্রায় তাহারই সমবয়স্ক, কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করে, ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। মিত্তিরদের আদুরে ছেলে আজ নির্জ্জন বাগানে লুকাইয়া কাঁদিতেছে,—একি অদ্ভুত রহস্য!

মাথার ডালাটা পথের একপার্শ্বে নামাইয়া সৈরভী বাগানে প্রবেশ করিল, নিঃশব্দপদসঞ্চারে অগ্রসর হইয়া একবারে চম্পকতলে উপস্থিত হইল, তাহার সহজে স্নেহপ্রবণ কোমল হৃদয় বালকের কান্নায় সমবেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। স্নেহার্দ্র কোমলকণ্ঠে সৈরভী বলিল, 'হিমুবাবু কাঁদছ? কি হয়েছে বাবু?'

বালক চমকিয়া উঠিল, লজ্জায় তাহার গোলাপী গণ্ডস্থল দুইটি আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে কামিনীঝাড়ের আড়ালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু সৈরভীও অল্পে ছাড়িবার মেয়ে নহে। একবার যে কাজ ঝোঁকে করে, তাহা জীবনে ছাড়িয়া দেওয়া তাহার ধাতুসহ ছিল না। সেও ছুটিয়া গিয়া হেমন্তর কাছে দাঁড়াইল—তখনও হেমন্ত দুটিহাতে চোখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। সৈরভী হেমন্ত হইতে হয় ত বছরখানেক বড়; কিন্তু এই সামান্য বড়ত্বের দাবীতে তাহার নারীর মন তখন হেমন্তর প্রতি মাতৃস্নেহে অথবা জ্যেষ্ঠা-ভগিনীর স্নেহে ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক নারীর মনই এমনই উপাদানে গঠিত যে, পুরুষকে অসহায় অসুস্থ অথবা দুর্ব্বল দেখিলেই তাহার প্রতি মাতৃস্নেহরসে ভরিয়া উঠে।

সে দুই হাতে হেমন্তর চোখ হইতে হাত দুখানা টানিয়া ছাড়াইয়া দিয়া কাতর কোমল করুণ-ভাষায় বলিল, 'কি হয়েছে হিমুবাবু, আমায় বলবে না? লক্ষ্মীটী!'

হেমন্তর প্রাণটা সহানুভূতির অনুকূল স্নেহের স্পর্শে আরও কাঁদিয়া উঠিল, সে তাহার কাঁধে ভর দিয়া ঝর ঝর কাঁদিয়া ফেলিল। অস্পষ্ট ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় সে বুঝাইল যে সে আজ ভোরে মায়ের চুলবাঁধার আয়নাখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, মা দেখিতে পাইলে ভয়ানক অনর্থ বাধাইবে।

'এই কথা? এর জন্যে কান্না? হাঃ হাঃ! চল হিমুবাবু তোমায় বাড়ী দিয়ে আসি, আমি তোমার আয়না এনে দেবো'

'হ্যাঁ! সে বুঝি সোজা কথা? আয়নার দাম কত, তা কি জানিস তুই?'

'কেন, সে ক গণ্ডা পয়সা?'

'পয়সা? হ্যাঁ! পয়সা খায় না—সে এক টাকা।'

'একটাকা—ষোলগণ্ডা?' কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই সৈরভী অঞ্চলের খুঁটে বাঁধা পয়সা খুলিয়া গণিতে আরম্ভ করিল,—একগণ্ডা, দুইগণ্ডা, দশগণ্ডা তিন পয়সা, আরত নাই। সে

পয়সাগুলা হেমন্তর হাতে ঢালিয়া দিয়া বলিল, 'এই নাও হিমুবাবু আজ এই রইল, কাল বাকিটা দিয়ে যাব, আয়না কিনে নিও।'

হেমন্ত বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সে বলিল, 'আর তুমি? তোমার মাকে গিয়ে কি দেবে?'

বালিকা হাসিয়া বলিল, 'বলব হারিয়ে গেছে, না হয় দু'ঘা মারবে।' কথাটা শেষ না করিয়াই সৈরভী হো হো হাসিয়া ছুটিয়া পলাইল। হেমন্ত অবাক হইয়া তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল।

২

এমনই প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। বালক বালিকা প্রায়ই চাঁপাফুল তলায় দেখা করে, বালিকা প্রায়ই বালককে পয়সাকড়ি দেয়, বালক অম্লানবদনে হাত পাতিয়া লয়। বালিকা বুঝিতে পারে না, কেন সম্ভ্রান্ত মিত্তিরবাবুদের বাড়ীর ছেলের পয়সার দরকার হয়, কিন্তু না বুঝিলেও সে তাহাকে পয়সা না দিয়া থাকিতে পারিত না,—উহা যেন তাহার নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। বালকও এই পয়সা যেন তাহার প্রাপ্য বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; যদি একদিন কোন কারণে বালিকা চাঁপাফুল তলায় উপস্থিত হইতে না পারিত, সেদিন সে মনে করিত, বালিকা তাহাকে তাহার প্রাপ্য হইতে ফাঁকি দিতেছে।

এমনই ভাবে স্কুলের ছুটিটা কাটিয়া গেল। বালক হেমন্তকুমার কলিকাতায় আত্মীয়ের বাড়ী থাকিয়া পড়াশুনা করিতে চলিয়া গেল। বালিকা সৈরভী প্রতিদিন চাঁপাতলায় যাইয়া শূন্য হৃদয় লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত। বালককে পয়সা না দিয়া তাহার প্রাণের ভিতর কেমন অস্বস্তি বোধ হইত। দুই একদিন রাত্তে সে ঘুমাইতে পারিল না, তাহার প্রাণটা গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে সর্ব্বদা কি যেন একটা অভাব অনুভব করিত। একটা বিষয়ে সে কতকটা স্বস্তি অনুভব করিত। যে চাঁপাফুল তলায় সে প্রথম দিন হেমন্তকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, সে প্রতিদিন সেই ফুলগাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়িয়া দুই চারিটা পয়সা পুতিয়া রাখিত। যখন পয়সাটার উপর মাটি চাপা দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইত, তখন তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইত।

আবার ছুটি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আবার হেমন্ত বাড়ী আসিল, আবার তাহাদের চাঁপাগাছের তলায় দেখা হইল, আবার সে তাহাকে পয়সা দিল। এমনই কত ছুটি আসিল গেল, এমনই একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন বৎসর চলিয়া গেল,—কিন্তু তাহারা যে সঙ্গে সঙ্গে বড় হইতেছে, সেকথা তাহাদের মনে হইত না। তাহারা যেন সেই বাল্যের বালক-বালিকা, সেকথা কাহারও মন হইতে একদিনও সরিয়া যায় নাই।

একদিন হেমন্ত বলিল, 'আচ্ছা, তুই যে আমায় রোজ রোজ পয়সা দিস, তা ফিরিয়ে নিবি নি ?'

সৈরভী বলিল, 'যখন দেবে তখন নোবো ?'

বালক—চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, 'না ভাই, এখন দিতে পারবো না, যখন বড় হব, তখন দোবো।'

বালিকা হাসিয়া বলিল, 'তাই দিও।'

বালক কৃতজ্ঞতাভরে হঠাৎ বালিকাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, করিয়াই তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে সে যদি দেখিত, তাহার এই ব্যবহারে বালিকার কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার হাসি কোথায় উড়িয়া যাইত, তাহা কে জানে!

বালকের খোলা প্রাণে দাগ লাগে নাই সত্য, কিন্তু বালিকার সমস্ত শরীর থরথর কাঁপিতেছিল। বালকের প্রথম অঙ্গস্পর্শে, বালকের প্রথম চুম্বনে, তাহার সর্ব্বশরীরের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছিল। সে তখন ষোড়শী যুবতী—তাহার প্রথম যৌবনের অতৃপ্তবাসনা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত ভীষণ আকার ধারণ করিয়া মাথা কাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। সে যে তখন কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

দিনের পর দিন যাইতেছিল, কিন্তু তাহার বুভুক্ষু হৃদয় হা হা করিয়া কাঁদিলেও সে অন্তরের যাতনা ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না। হেমন্ত বেশ হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, পয়সা লইবার সময় তাহার সহিত হাতকাড়াকাড়ি করিত, কখনও বা রহস্য করিয়া তাহাকে আবার চুম্বন করিবার ভাণ করিত। সৈরভীর সমস্ত প্রাণটা সেই চুম্বনের আশায় শিহরিয়া উঠিত বটে, কিন্তু মরীচিকার মত নিকটে আসিয়াও আশা দূরে সরিয়া যাইত, চঞ্চল চপল বালক হেমন্তর মনে তখনও কোনও দ্বিধার ভাব উপস্থিত হয় নাই।

একদিন আবার পয়সা ফিরাইয়া দিবার কথা হইল। সেদিন সৈরভী লজ্জার মাথা খাইয়া বলিয়া ফেলিল, 'আমি পয়সা ফিরিয়ে চাইনা, তুমি যা একদিন দিয়েছ, তাই যথেষ্ট। ইচ্ছে হয় আবার দিও, না হয় দিও না; কিন্তু আমি যা দিয়েছি, তা আর ফিরিয়ে চাই না।'

হেমন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, 'আমি? আমি দিয়েছি? আমি কি দিয়েছি? আমার ত মনে পড়ে না।'

সৈরভী লজ্জায় মরিয়া গেল। তথাপি আপনাকে সংযত করিয়া বলিল, 'মনে না পড়ে ভালই। কিন্তু যা দিয়েছ, তাই আমার অনেক। আমি পয়সা ফিরিয়ে চাইনা।'

হেমন্ত মহা খুসী হইল। সে এদিনও সৈরভীকে বুকে টানিয়া মুখচুম্বন করিতে গেল; কিন্তু সৈরভী তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'খবরদার, অমন কাজ কোরোনা বাবু, তাহলে আর দেখা কোরবো না।'

হেমন্ত হাসিয়া ছুটিয়া পলাইল। সে সেদিনে চুম্বনে সৈরভীর আনন্দ, আর এদিনে চুম্বনে

সৈরভীর ক্রোধের অর্থ কিছুই বুঝিল না। অবশ্য প্রেমিক হইলে সে সবই বুঝিতে পারিত। সৈরভী যে তাহার ভালবাসা চাহিয়াছিল, খেলা চাহে নাই, তাহা সে অপ্রেমিক কিরূপে বুঝিবে?

এমনই করিয়া আরও চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। তখন সৈরভী ২১ বছরের, আর হেমন্ত ২০ বছরের। তখন হেমন্ত একটু গম্ভীর হইয়াছে, তখন আর সে ছুটিতে বাড়ী আসিলে ভদ্দরবাগানে যায় না, চাঁপাগাছতলায় দাঁড়ায় না, সৈরভীর সহিত সাক্ষাৎ করে না। সৈরভী কতদিন সেখানে আসিয়া হতাশমনে ফিরিয়া গিয়াছে, কতদিন অপেক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ব্যথাহত হৃদয়ে অভিমানভরে বাগান হইতে বিদায় লইয়াছে। তবুও সূর্য্য-উপাসকরা যেমন দূর হইতে সূর্য্যদেবকে দেখিয়া প্রণিপাত ও পূজা করে, তেমনই করিয়া সে দূর হইতে তাহাঁর প্রেমপাত্রকে দেখিত, পূজা করিত, প্রাণঢালা ভালবাসার অর্ঘ্য দিত।

কত ভাল সম্বন্ধ আসিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সৈরভীর মাতা সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করিলেও শেষ মুহূর্ত্তে সব ফাঁসাইয়া দিয়া বলিত, "আমি সাঙ্গা করিব না।" এমন একগুঁয়ে মেয়েকে কে কি করিতে পারে? শেষে সৈরভীর মা বিষম পীড়াপীড়ি করিলে সৈরভী যখন গলায় দড়ী দিয়া অথবা জলে ডুবিয়া মরিবার ভয় দেখাইয়াছিল, তখন হইতেই তার মা বিবাহের সম্বন্ধ করা বন্ধ করিয়াছিল। পাড়া-বেপাড়ার বহু বোষ্টুম যুবক সৈরভীর রূপে আকৃষ্ট হইলেও তাহার তেজ ও ঝাঁঝের কাছে অগ্রসর হইতে ভরসা পাইত না।

একদিন সৈরভী হাটে শাড়ী কিনিয়া ফিরিবার সময় সন্ধ্যার প্রাক্কালে হেমন্তকে এক বন্ধুর সহিত ষষ্ঠীতলার মাঠের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল; বন্ধুটীকে হেমন্ত কলিকাতা হইতে আনিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিয়াই সৈরভী পথের বেড়ার পার্শ্বে লুকাইয়া রহিল। পথটা গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্জ্জন, কেননা, সে পথটা মাঠে যাইবার পক্ষে সুবিধাজনক নহে, অনেকটা ঘুরিয়া যাইতে হয়। সৈরভী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক তাহার পার্শ্বেই ভদ্দরবাগান। সৈরভী ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া স্পষ্ট শুনিল, হেমন্ত তাহারই সম্বন্ধে বিদ্রূপব্যঙ্গ করিয়া বন্ধুকে বাগানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে, আর দুইবন্ধুতে খুব হাসিতেছে। সে দুই একটা কথা শুনিতে পাইল, 'বোষ্টুমদের মেয়ে, বিধবা, ইত্যাদি।' বন্ধু হেমন্তর নিকট পরিচয় পাইয়া বলিল, 'তা হাতে পেয়ে শিকার ছাড়লি কেন?'

হেমন্ত হাসিয়া জবাব দিল, 'দূর; তা কি হয়? ছোট জাতের মেয়ে, শেষে গাঁয়ে একটা কেলেঙ্কারী হ'য়ে যেত। তুমি যাই বল, মেয়েটা খাসা দেখতে, আমাদের বামুন কায়েতের'—

সৈরভী আর শুনিতে পাইল না, বন্ধুরা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। সৈরভী মরমে মরিয়া গেল। কিন্তু তাহার অন্তরে একটা জিনিষের অভাব ছিল না, সেটা তাহার দুর্জ্জয় মনোবল। সে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদবধি প্রকাশ্যে বুক ফুলাইয়া সে ক্ষণে অক্ষণে হেমন্তর সম্মুখে উপস্থিত হইত, তাহাদের বাড়ী গিয়া মাল বেচিবার অছিলায় অনেকক্ষণ কাটাইয়া দিত, বাড়ীতে বা পথেঘাটে তাহার দেখা পাইলেই পাইয়া বসিত এবং হাসি তামাসায় তাহাকে ও তাহার বন্ধুকে

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। অথচ তাহারা কোনওরূপ শিষ্টাচার অতিক্রমের চেষ্টা করিলে এমন মূর্ত্তি ধারণ করিত যে, তাহাকে দেখিয়া তাহাদের ভয় হইত।

একদিন সৈরভী শুনিল, হেমন্তর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। ইহার পর সে গ্রামে খুব ধূমধামের আয়োজন দেখিল। হঠাৎ একদিন সোনাদানায় তাহার মাসীর পীড়ার কথা শুনিয়া সে মাতার সহিত গ্রাম ত্যাগ করিয়া মাসীর বাড়ী গেল। যেদিন ফিরিয়া আসিল, সেদিন দেখিল, তাহাদেরই বাড়ীর পাশে বাজারখোলার কালীবাড়ীতে মহাআড়ম্বরে এক বরকনেকে মানসিক পূজা দিতে আনা হইয়াছে। বহুমূল্য রত্নালঙ্কার-ভূষিতা নববধূর পার্শ্বে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিহিত বরকে সে চিনিল,—সে হেমন্তকুমার!

ইহার পর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সংসার যেমন চলিয়া থাকে, তেমনই চলিয়াছে, কেবল মানুষের জীবনে কত কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হেমন্তকুমারের পিতৃমাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, এখন তিনিই সংসারের কর্ত্তা, তাঁহার পুত্রকন্যা অনেকগুলি, তিনি এখন দেশে আসিয়াই বসবাস করিতেছেন, জমিদারী দেখিতেছেন।

সৈরভীর মাও ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে, এখন সৈরভীই গৃহিণী, একাকী গৃহের বাসিন্দা। সে এখন মধ্যবয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার এখনও যৌবন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিত, তাহার চুলে পাক ধরে নাই, শরীরের চর্ম্ম লোল হওয়া দূরে থাকুক, কোথাও বিন্দুমাত্র কুঞ্চিত হয় নাই, দেহের লাবণ্য ও শ্রী পূর্ব্বেরই মত অক্ষুণ্ণ আছে। হেমন্তের বেলা একথা বলা চলে না। গ্রামের আর পাঁচজন দেখিত, সে স্থূলোদর হইয়াছে, তাহার গায়ের চামড়া লোল হইয়াছে, কেশে শুভ্ররেখা দেখা দিয়াছে। সে এখন পল্লীগ্রামের গরীয়ান জমিদারের দশজনের একজন হইয়াছে। কিন্তু সৈরভী হেমন্তের কোন পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারিত না! যৌবনের প্রথম প্রভাতে মুকুলিত আশা-আকাঙ্ক্ষার রক্তরাগে সে সেই যে চম্পকবৃক্ষমূলে হেমন্তকে দেখিয়াছিল, প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌছিয়াও সে তেমনই কামনার গোলাপী আভায় তাহার বাঞ্ছিতকে স্নাত, প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছিল। দূর হইতে সে তাহাকে মানসমন্দিরে বসাইয়া পূজা করিত—দূরে থাকিয়াও সে তাহাকে সদাই নিকটে রাখিত, আর আকুল আকাঙ্ক্ষায় প্রার্থনা করিত, 'হে আমার ঈপ্সিত! তুমি দূরে থাক ক্ষতি নাই, কিন্তু গোপনে আমাকে তোমার পূজা করিতে দাও। এজন্মে না পাই, জন্মে জন্মে তপস্যা করিয়া তোমায় একদিন পাইবই!'

কতদিন অতর্কিতভাবে গ্রামের লোক দেখিয়াছে, সৈরভী ঊষার অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া নিভৃতে চম্পকতলে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে, কতদিন কত লোক কত আলো-আঁধারে সৈরভীকে চম্পকবৃক্ষে ফুলের মালা দোলাইয়া দিতে দেখিয়াছে, কতদিন বাগানের মালী সবিস্ময়ে দেখিয়াছে, সৈরভী চম্পকবৃক্ষকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতেছে,

তাহার দুইনেত্রে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কেহ তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইত না, কেন না তাহার মুখের ঝাঁঝের কাছে কেহ স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইত না।

সৈরভী বাড়ী বাড়ী তেমনই করিয়া ফিরি করে, হেমন্তের বাড়ী লুকাইয়া তাহার পুত্রকন্যা-দিগকে বুকে জড়াইয়া ধরে, কত পয়সা খেলানা দিয়া ভুলাইয়া মুখ চুম্বন করে। একদিন হঠাৎ হেমন্তের গৃহিণী দ্বিতলের দালান হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং স্বামীকে এবিষয়ে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমাদের গাঁয়ের ছোট লোকেদের কি আস্পর্দ্ধা গো—ঐ বোষ্টুম মাগী বুদ্ধানকে কোলে নিয়ে চুমো খাচ্ছে—আবার হাতে পয়সা গুঁজে দিচ্ছে। মরণ আর কি!

কর্ত্তা ইহাতে আপনাকেই অপমানিত মনে করিলেন—তাঁহার মনে পূর্ব্বকথা জাগিয়া উঠিল। বোষ্টুম মাগী, তার এত স্পর্দ্ধা! ছেলেবেলায় তিনি তাহার নিকট দুই চার পয়সা লইয়াছিলেন, তাহারই এত দাবী?

পুরুষসিংহের আর সহ্য হইল না। একদিন সৈরভীকে নির্জ্জনে পাইয়া খুব দুই কথা শুনাইয়া দিলেন, 'খবরদার সে যেন আর তাঁর ছেলেদের হাতে পয়সা কড়ি না দেয়, দিলে দারোয়ানের হাতে অপমান হইবে। ছোটলোক কোথাকার!'

সৈরভী সেইদিন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া জলস্পর্শ করিল না, মাথা ধরিয়াছে বলিয়া সেই যে সন্ধ্যার পর শয্যাগ্রহণ করিল, তিনদিন আর উঠিল না। তাহারই এক দরিদ্র আত্মীয়াকে সে কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। সেও দুই বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছে। সুতরাং তাহার মুখে এক ফোঁটা তৃষ্ণার জল দিবে এমন লোক তাহার গৃহে ছিল না। তিন দিন অনাহারে অসুস্থ অবস্থায় থাকিয়া সৈরভী গা ঝাড়িয়া উঠিল, দুর্জ্জয় অভিমান ভরে আপন মনে বলিল, 'কেন, আমার কি হয়েছে? আমি ছোটলোক হতে পারি, কিন্তু আমারও কি মান অপমান নেই? যে যার নিজের জেতে বড়।'

সে তীরের মত উঠিয়া ঘর দুয়ার সাফ করিল, স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিল; পরে ডালা পাড়িয়া বেসাতির জিনিষ সাজাইতে লাগিল। কিন্তু অন্ন প্রস্তুত হইলেও সে অন্ন তাহার আর মুখে উঠিল না, ডালা সাজাইতে সাজাইতে তাহার কম্প দিয়া জ্বর আসিল, সেদিন সেরাত্রি সৈরভী বেহুঁস হইয়া পড়িয়া রহিল। পরদিন প্রভাতে বাজারপোলার কালীবাড়ীর পূজারী কালিদাস আচার্য্য পূজা সারিয়া মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইবার সময় সৈরভীর ঘরের দিক হইতে গোঙানি আওয়াজ শুনিয়া বিস্মিত হইয়া সৈরভীর বাড়ীর উঠানে গিয়া ডাকিলেন, 'সৈরভী, সৈরভী!'

অতি ক্ষীণকণ্ঠে সৈরভী ডাকিল, 'আচায্যি-ঠাকুর একবার ঘরে এস, আমি বুঝি বাঁচিনি।'

পূজারী ঘরে উঠিয়া সৈরভীর অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন এবং তখনই পাড়ায় তাহার আত্মীয়দিগকে খবর দিয়া কবিরাজের বাড়ী গেলেন। কবিরাজ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া

দেখিলেন, সৈরভী তেমনই একলা পড়িয়া আছে। বুঝিলেন, আত্মীয়েরা সৈরভীর মুখের ঝাঁঝের প্রতিশোধ লইতেছে!

কবিরাজ মহাশয় ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলে পর আচার্য্য সৈরভীর সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য বাহিরে যাইতেছিলেন, সৈরভী হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল? ক্ষীণস্বরে বলিল, 'ঠাকুর পায়ের ধুলো দিয়ে যাও, হয় ত আর দেখা হবে না। এই খেনে —এই বুকে বড় ঘা খেয়েছি, আর বাঁচবো না, আজ রাতেই সব শেষ হবে। একটা কথা, একবার বামুন মাকে পাঠিয়ে দিও, মরবার আগে দুটো কথা বলে যাব।'

ইহার পরদিন গ্রামের লোক সবিস্ময়ে শুনিল, সৈরভী বোষ্টুমী শেষ রাতে মারা গিয়াছে। কবেইবা তাহার রোগ হইল, আর কবেইবা সে রোগ বাড়িল, তাহা কেহই জানে না, কাজেই সকলেই অল্পবিস্তর বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, আহা! অধিকাংশ লোকই মনে মনে সন্তুষ্ট হইল, কেননা অনেকেরই চুলের টিকি সৈরভীর কাছে বাঁধা ছিল, সৈরভী চোটায় টাকা খাটাইত। সৈরভীর কেহ ওয়ারিশেন নাই, কাজেই খাতকেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বিশেষতঃ মাগীর যে মুখের ঝাঁঝ! কত লোক বিবাহের প্রস্তাব করিতে গিয়া তাহার কাছে ঝাঁটা দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

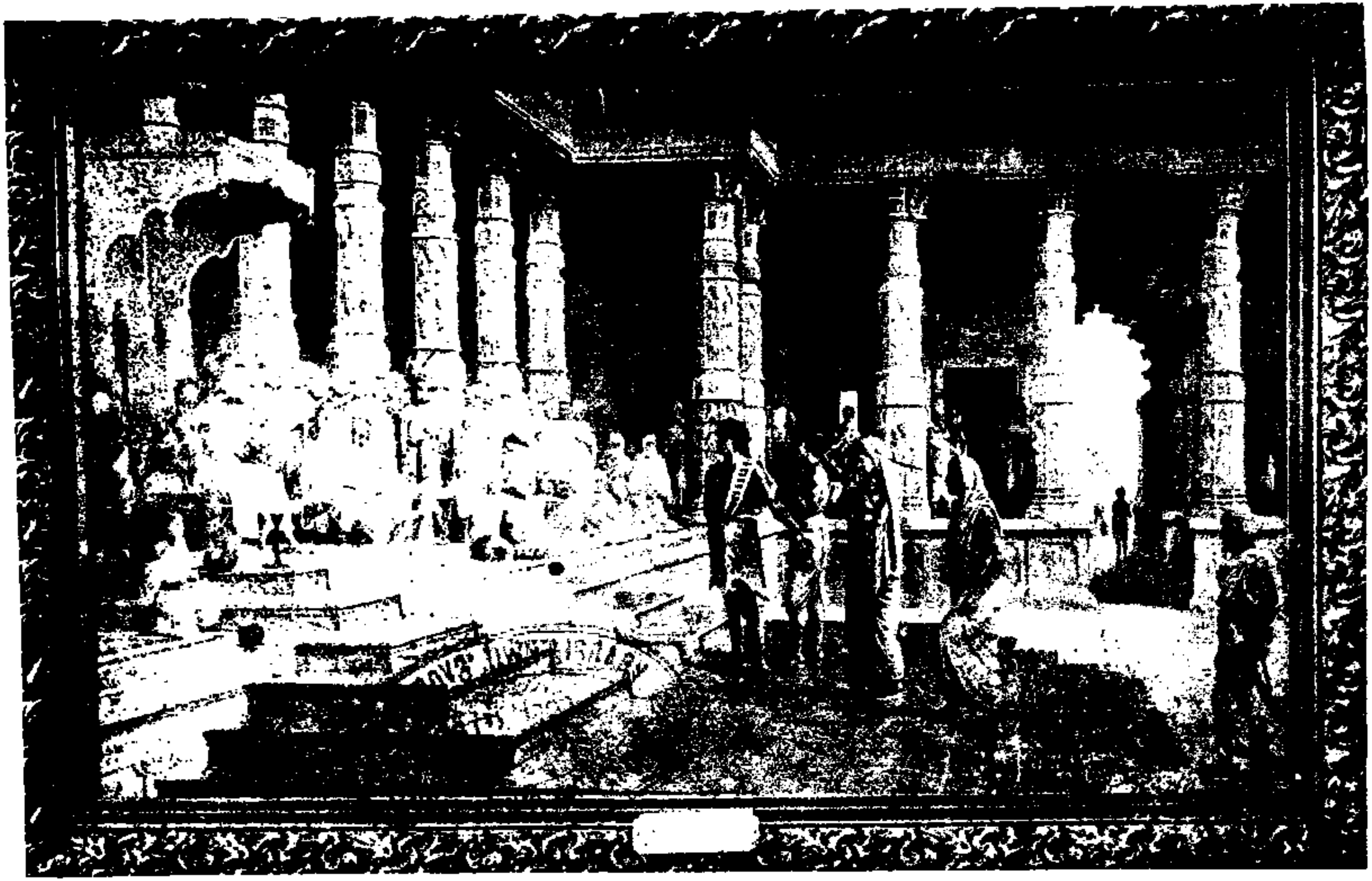
মিত্তিরবাবুদের বাড়ীতে সৈরভীর কথা হইতেছিল। স্বামী স্ত্রীর মুখে সৈরভীর সম্বন্ধে নানা মন্তব্য বাহির হইতেছিল। স্ত্রী বলিতেছিলেন, "আহা মাগী বেঘোরে মোলো! যাই হোক, দোষে গুণে লোকটা ভাল ছিল। আমার ছেলেপুলেকে কি ভালই বাসত! তোমায় এদ্দিন বলিনি, লুকিয়ে তাদের কত খাবার কত খেলনা দিয়ে যেত। আর একটা আশ্চর্য্যির কথা,—আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে কাউকে জানাতে বারণ করে কত দামী দামী ভাল সাড়ী শাঁখা দিয়ে গিয়েছে,—দাম দিতে গেলে পায়ে ধরে কেঁদেছে। এমন মানুষ কখনও দেখিনি।'

হেমন্তবাবু কেবল একটা 'হুঁ' দিয়া অন্যমনে গড়গড়ার নল টানিতে লাগিলেন। এমন সময় বাহির হইতে 'বাবু বাড়ী আছেন নাকি' বলিয়া আচায্যি ঠাকুর খড়ম ঠক ঠক করিয়া হাজির—তাঁহার সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার ছিল! গৃহিনী তাঁহাকে দেখিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তিনি নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'না মা, তোমাকেও একটু দাঁড়াতে হবে। সৈরভীর সম্বন্ধে কথা আছে।'

হেমন্তবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সৈরভীর সম্বন্ধে? তা আমাদের তাতে কি?"

"আছে, ব্যস্ত হোয়ো না বাবু, তোমাদেরও তাতে দরকার আছে।'

স্বামী স্ত্রী একই সঙ্গে বলিলেন,—"কি বলুন।"



'দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলা'

শিল্পী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

তখন আচাৰ্য্যি ঠাকুর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "কাল রাতে সৈরভীর কথা মত আমার ব্রাহ্মণীকে তার কাছে পাঠিয়েছিলুম। সৈরভী তার কাছে যা বলেছে, তা শুনে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছি। এমন ঘটনার কথা কখনও শুনিনি। সে তাঁর পা ছুঁয়ে বলেছে যে, সে যা বলেছে সব সত্যি, একবর্ণও মিথ্যে নয়। সে তার যথাসর্ব্বস্ব বাবাজী তোমাকেই দিয়ে গিয়েছে।"

স্বামী স্ত্রী চমকিত হইয়া উঠিলেন, কর্ত্তা বলিলেন, 'আমাকে' ?

আচার্য্য বলিলেন, "হ্যাঁ তোমাকে। আর তার কাপড় শাঁখা কলি তৈজসপত্র আসবাব পত্র ইত্যাদি যা কিছু জিনিষপত্র আছে তা তোমার স্ত্রীকে দিয়ে গিয়েছে; খেলানাগুলো তোমার ছেলেদের।"

উভয়ে উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া বলিলেন "এঁ্যা, সেকি, সেকি!"

"হাঁ, যা বলছি, সব সত্যি, একবিন্দুও মিথ্যে নয়। মা কালীর নামে শপথ করিয়ে নিয়ে আমার স্ত্রীকে কোথায় কি আছে তা জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সে বড় সামান্য নয়, শুনলে অবাক হবে।"

"কি রকম?"

"তার শোবার ঘরের মেঝেয় পোতা নগদ টাকায়, দু'হাজার টাকা আছে। তার খাতকের নামের চিঠে, তাও প্রায় হাজার দুয়েক। সিন্দুকভরা বাসনকোসন, তাকের উপর সাজান কাপড়-শাড়ীর ডাঁই, আরও কত কি। তারপর বাড়ী বাগান গরু বাছুর সব। আর—আর একটা খুব আশ্চর্য্যের কথা, তোমাদের ঐ ভদ্দরবাগানের চাঁপাতলায় পোতা নাকি তার বিস্তর পয়সা আছে,—তা কুড়িয়ে বাড়িয়ে হয়ত শ তিনেক টাকা হবে—সেটা সে তোমাকে নিজের হাতে খুঁড়ে নিয়ে আসতে বলেছে!"

স্বামী-স্ত্রী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর হেমন্তকুমার গলা ঝাড়িয়া ভারী গলায় বলিলেন, 'কেন এমন করে গেছে, তা কিছু বলে গেছে?'

আচার্য্য বলিলেন, 'হাঁ, তাও বলে গিয়েছে, তবে, তবে, সেটা বৌমার সামনে বলা—'

গৃহিণী আরও পাকাপোক্ত হইয়া বসিয়া বলিলেন, 'যখন সব বললেন, তখন একথাটাও না শুনে যাব না!'

আচার্য্য একবার হেমন্তর মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার মুখে সম্মতির লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "অভাগিনী তোমায় ভালবাসত। যেমন তেমন ভালবাসা নয়, সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, একথা আমি তার কথার আভাসে বুঝেছি। কিন্তু তোমায় জানতে দেয়নি'—

গৃহিণী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'আ মর! আস্পর্দ্ধা দেখ! ছোটলোক কিনা!'

কর্ত্তা হো-হো হাসিয়া বলিলেন, 'বাঃ বাঃ একবারে রোমান্স! তার পর?'

আচার্য্যমহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'বাবাজী উপহাস কোরো না, বোষ্টুমই হোক আর

যাই হোক, সবাই মানুষ, সবাইয়েরই একটা প্রাণ আছে। যাই হোক, যা বল্‌বার তোমায় বলে গেলুম, এখন তোমার জিনিষপত্র বুঝে নাও।'

কর্ত্তা বলিলেন, 'তা এর লেখাপড়া আছে? না, কেবল মুখের কথা।'

আচার্য্য বলিলেন, 'সে সব ঠিক আছে। আগে থেকেই সে উইল রেজেষ্ট্রি করে রেখেছিল, এই নাও সেই উইল।'

আচার্য্য যাইবার সময় বলিলেন, 'হাঁ, আর একটা কথা, তার একটা বড় আদরের কুকুর ছিল। দুটো পোষা বেরাল আর গোটা দুই পাখীও আছে। সেগুলোর কথা উইলে কিছু লেখেনি। সেগুলোর ভার অবশ্য তুমি নেবে।'

গৃহিণী চোখ ঘুরাইয়া ঘৃণার স্বরে বলিলেন, 'মাগো কুকুর, দূর দূর!'

কর্ত্তা বলিলেন, "ঐ গরুবাছুর নিতে পারি, আর যা জানোয়ার আছে, বিলিয়ে দিতে পারেন।"

আচার্য্যঠাকুর বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আমিই ওগুলোর ভার নোবো, তোমাদের ভাবনা নেই।' তাঁহার চক্ষুতে সকলের অলক্ষ্যে একফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

যাইবার সময় ব্রাহ্মণ বাহির হইতে স্পষ্ট শুনিলেন, গৃহিণী ঘৃণাভরে ব্যঙ্গস্বরে বলিতেছেন, 'মর! ছোট জেতের আবার ভালবাসা!' আর কর্ত্তা হো-হো উচ্চহাস্তে ঘর ভরাইয়া দিতেছেন!

অম্বুরা

শ্রীসুরুচিবালা রায়

১

—রমেশবাবুর ছেলেটীকে দেখেছিস, মন্দা ?

—কই, না, দেখিনি ত, কতবড় ছেলেটী দাদা ? কোথায় ?

—ঐ ওদিকেত ছিল ; কতবড় আর ? বছর আষ্টেক হবে ! বেশ ছেলেটী,—

—তুমি কাছে ডাকলে দাদা ? এলো ?

—এলো কি আর ? অচেনা মানুষ ত ? আমিই গেলুম কাছে, আহা, দেখলেই কেমন মায়া হয়, ছেলেটাকে দেখিস্-শুনিস্ দিদি, একটু আদর-টাদর করিস্, আদর না পেলে ছোট ছেলে বশ হবে না !

শুভ্র মুখখানিতে মন্দার গোলাপের আভা ছিটাইয়া গেল, বধূবেশিনী এই ছোট বোন্‌টীর নত মুখখানির পানে, বিমলবাবু সস্নেহ-সজলনয়নে চাহিয়া রহিলেন।—ছোট ছেলেটীকে দেখিয়া, মনটা তাহার পূর্ব্বাবধিই কোমল হইয়াছিল, তাঁহারও ঘরে যে এম্‌নি একটী সগুমাতৃহীন ক্ষুদ্র শিশু, নিশিদিন ঘরখানিকে কিসের একটা স্মৃতির ভারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাকে দেখিয়া সেই স্মৃতিই তাঁহাকে কেবল বারবার পীড়ন করিতে লাগিল।—ছোট ছেলেটী,—আহা,—লোকে ঘরে বিমাতা আনিতে ভয় পায়, মন্দাও যদি শেষকালে—শিহরিয়া উঠিয়া বিমলবাবু আপনিই তাহার মীমাংসা করিয়া লইলেন, নাঃ তাও কি হয় ? মন্দা ত তাঁহার তেমন বোন নয়।

২

—আঃ, মাগো, কি কুলগুলোই তখন থেকে খাচ্ছিস্ গোপ্‌লা ? উঠে আয়, মা ডাক্‌ছেন।

—মা !—মা আবার কোথা ?—লালাসিক্ত প্রকাণ্ড কুলটা মুখ হইতে অবাধে লইয়া, বড় বড় চোখ দুটিতে বিশ্বের বিস্ময় ফুটাইয়া তুলিয়া গোপাল প্রশ্ন করিল, মা আবার কোথা ? মা'ত সেই কবে মরে গেছে !

—নতুন মা রে ! সেই নতুন বউ,—সেই যে শাড়ীপরা, গয়না গায়, রাঙ্গা রাঙ্গা চেহারা।—সে, পরম নিশ্চিন্তভাবে কুলটা পুনরায় মুখে তুলিয়া, লালাসিক্ত হাতখানি পাঞ্জাবীতে মুছিতে মুছিতে গোপাল উত্তর দিল,—

—ধ্যেৎ, সে আবার মা! সেত বাবার কনে! ওবাড়ীর দিদিমা বলেছে, তার কাছে যেতে নেই, ও মন্তর পড়ে ছুঁচো করে দেবে।

ভগিনীটি আশঙ্কায় মরিয়া গিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে উত্তর করিল,—কি যে বলিস্ গোপ লা, শুনতে পেলে যে মেরে ফেলবে, বাগ্দীপাড়ায় ঘুরে ঘুরে বাগ্দীদের মত কথা শিখেছিস্,—এইজন্যই ত বাবা তোকে এত মারে।

ভগিনীর কান্নায় এবং দোষারোপে বিরক্ত হইয়া গোপাল মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল—বাবা এত মারে! যাঃ যাঃ, সেদিন রামাজেলেও বল্ছিল মেয়েরা ওরকম প্যানপেনে হয়,—কাঁদ্ছিস্ কেন? তোকে কি আমি মেরেছি?

—আজ যে তুই নিজে মার খাবি হতভাগা ছেলে? বাবা যখন সেই চাবুকটা দিয়ে পিঠ তোর ফুলিয়ে দেবে, তখন পালাবি কোথা?

—সেই চাবুকটা ত? সেত আমি কবে পুকুরে ফেলে দিয়েছি, সে আর পাবে কোথা?...... বালক বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হাসিতে লাগিল।

—তা বেশ করেছিস্।—লক্ষ্মী ভাইটী আমার, এখন ত চল, ডাকছে যে, আমি তোর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, কার সাধ্যি তোকে ছুঁচো করে!

—তুই ত মেয়েমানুষ, তোর কি জোর আছে গায়ে? আয় ত দেখি কেমন পাঞ্জা লড়্‌তে পারিস্? উপকথার গল্পে ত দিদিমা সেদিন বল্লেই, মেয়েমানুষগুলো সব হাওয়া দিয়ে তৈরী।

অগত্যা অকৃতকার্য্য হইয়া ছোট গোল হাতখানি তুলিয়া ভাইটীর পিঠে গোটাকয়েক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীল বসাইয়া দিয়া ক্ষুদে দিদিটী ফিরিয়া চলিল, ঘরে বিমাতার কাছে গেল না, ঘরের পেছনদিকের একটা জানালার নীচে বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া দিদিটি কাঁদিতে লাগিল, সকালবেলা পিতার কাছে একটু বিশেষভাবে তিরস্কৃত হইয়া, এবং অবুঝ ভ্রাতার ব্যবহারে, নতুন করিয়া আজ আবার তাহার মাতৃশোক উথলিয়া উঠিয়াছে,—ইহা ছাড়া, মা বলা যায় সংসারে অনেককেই, কিন্তু মায়ের জায়গায় যে অচেনা নতুন মানুষটি আসে, তাহাকে মা বলিতে আজ এই ক্ষুদ্র বালিকাটীরও বুক ফাটিয়া যাইতেছিল!

৩

মন্দার একটা সহজ গুণ ও শক্তি ছিল, যাহাতে দুইদিনেই রমেশবাবুর ক্ষুদ্র সংসারখানি তাহার পদতলে বশ্যতা স্বীকার করিয়া লুটিয়া পড়িল। গৃহকর্ত্তা হইতে বাড়ীর ঝি চাকরগুলি পর্য্যন্ত নূতন কর্ত্রীর হুকুমের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিত, কিন্তু বশ মানিল না কেবল মাতৃহারা দুরন্ত বালক গোপাল। মন্দা তাহার স্বভাব-কোমল হৃদয়খানির সকলটুকু স্নেহ ও সহানুভূতি উজাড় করিয়া দিয়াও, এইক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র বালকটীকে তাহার আপনার করিতে পারিল না।

সারাদিন উলঙ্গ গায়ে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া গোপালের দুরন্তপনা দিনে দিনে কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছিল, সঙ্গীদের কাহারও ঘুড়ি লাটাই কাড়িয়া লইয়া, কাহারও সখের গাছিটির ফুলটী ছিঁড়িয়া, ডালপালা ভাঙ্গিয়া, কাহারও গায়ে কাদা ছুঁড়িয়া, কাহাকেও নালায় ডোবায় ফেলিয়া দিয়া, গোপাল গভীর একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। মন্দার বিবাহের পর হইতে অন্তঃপুরের সকল সম্পর্ক সে একেবারে ছাড়িয়াই দিয়াছিল; গ্রামে তাহার হিতৈষী ঠাকুরমা দিদিমার অভাব ছিল না, সুতরাং বাড়ীতে না খাইলেও উপোসে তাহাকে মরিতে হইত না, কেবল রাত্রিবেলা ঘুমাইবার সময়টীতে দিদির পাশটী না হইলে তাহার চলিত না।

এই হতভাগা ছেলেটার প্রতি পিতার কোনকালেই কিছুমাত্র মমতা ছিল না, ইহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুষ খাওয়ার অপরাধে উপর হইতে তাহাকে যে ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, তাহাতেই এই জন্ম-অপয়া ছেলেটার প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণার আর সীমা পরিসীমা ছিল না। আবার বালকোচিত বা ততোধিক যে দুরন্তপনা গোপালের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছিল, পিতার নিকট তাহা কেবল বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হইত। পুত্রের প্রতি পিতার এইভাব, মাতার নিকট কিছু অপরিজ্ঞাত ছিল না, তাই তিনি প্রতি মুহূর্তে আপনার স্নেহচ্ছায়ায় পুত্রকে কেবল গোপন রাখিয়াই চলিতেন।

মাতার মৃত্যুর পর গোপালের পানে চোখ তুলিয়া চাহিবার আর কেহ রহিল না, একমাত্র যে স্নেহের শাসনে এতদিন সে বশ ছিল সহসা অতর্কিতে মাথার উপর হইতে সেইটি সরিয়া যাওয়াতে তাহার শিশুহৃদয়ে যে দুঃখ, এবং মাতার প্রতি যে দারুণ অভিমানের সৃষ্টি হইল, তাহাতে সে ইচ্ছা করিয়াই, দুরন্তপনা আরও বাড়াইয়া তুলিল। ফলে এই হইল, যাহা করিবার ইচ্ছা, আদৌ তাহার কল্পনাতেও উদয় হইত না, পিতার তিরস্কারে ও প্রহারে তাহারই প্রতি মন তাহার ঝুঁকিয়া পড়িত, এবং এমনি করিয়া পিতার নিকট হইতে দূরে সরিয়া, উভয়ের মধ্যে শুধু একটা ঘনীভূত ব্যবধানেরই সৃষ্টি হইল।

তথাপি, পিতার প্রতি পুত্রের স্বভাবজাত যেটুকু আকর্ষণও ছিল, বিমাতার প্রতি তাহাও হইল না। প্রতিমার মত চেহারা খানির উপর, টুকটুকে সাড়ীও ঝকঝকে গয়না দেখিয়া, প্রথমে নববধূর প্রতি গোপালের যে একটা লোভ জন্মিয়াছিল, পাড়ার সমালোচনা শুনিয়া এবং মাতার পরিত্যক্ত ঘরে ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া দারুণ বিতৃষ্ণা এবং বিদ্বেষে তাহার ক্ষুদ্র বুকখানি পরিপূর্ণ হইয়া গেল—এবং তাহার ক্ষুদ্রমনে যতখানি বোধ ছিল, সকলটুকু দিয়া সকল রকমে সে তাহাকে অবহেলা করিয়া চলিল।

শীতের কুহেলীঢাকা পৌষের সকালটি!

জ্বলন্ত উনুনে জলের কেটলী চড়াইয়া সম্মুখে বসিয়া মন্দা ময়দা মাখিতেছিল, পিঠে-পড়া

স্নানসিক্ত একরাশ চুল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া জায়গাটা ভিজিতেছিল। মুখখানা কিছু মলিন, মনটা একটু অন্যমনস্কের মত, পাশে বসিয়া উমা চায়ের পেয়ালা পিরিচগুলি সাজাইয়া রাখিতেছিল, সস্নেহ নয়নে তাহার পানে চাহিয়া মন্দা কহিল, "এই শীতে, এত ঠাণ্ডায় স্নান করে শুধু সেমিজটা পরলি উমা,—গরম জামাটা কেন গায় দিলি নে?"

"তুমি একলাটি খাবার করচ মা, তাড়াতাড়ি তাই চলে এলাম।"

"পাগল, একলাটি করচি বলে জামাটা গায়ে দেবার সময় হল না? যা, যা, জামাটা গায় দিয়ে আয় মা, আবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখে ভুগবি এখন।"

ধীরে ধীরে উমা বাহির হইয়া গেল। তাহার বালিকাসুলভ স্বচ্ছন্দ গতির পানে চাহিয়া চাহিয়া মন্দার বুকটা চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠিল। আহা, এই মেয়েটাকে এর বাবা কিনা টাকার লোভে এক দোজবরের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়! কথাই আর কাকে বলে! এর মা নাই বলিয়া কি ইহার পানে চাহিবার আর কেউ নাই? মন্দার তেজোন্নত মন দৃঢ়পণে বার বার কহিতে লাগিল, দেখি একে রক্ষা করিতে পারি কি না!

জামা গায় দিয়া উমা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "জানো মা গোপালটা কি রকম যে করছিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, কাছে গিয়ে ডেকে দিতেও কিছুতেই উঠলে না, আর গা'টা যেন আগুনের মত গরম!"

—গরম! জ্বর হয়েছে? চল্‌ত দেখে আসি!

গায়ে কম্বল জড়াইয়া ছোট মানুষটী বিছানার একপাশে পড়িয়া কোঁকাইতেছে, মন্দা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ তাহাই দেখিল, তার পর বিছানায় বসিয়া সস্নেহে ছোট দেহখানি কাছে টানিয়া মুখ হইতে কম্বলখানি সরাইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল,—গোপাল, বাবা!—

জ্বরের ঘোরে গোপাল মাকেই বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছিল, ক্ষুদ্র হাত দুখানি দিয়া আপনার অজ্ঞাতেই বিমাতাকে জড়াইয়া ধরিল।

এতটা আশা মন্দা করে নাই, তাড়না খাওয়াই যাহার প্রতিদিনের অভ্যাস, আজ যে এমন ভাবে এই বরণ তাহাকে উতলা করিয়া তুলিল; বধূজীবনের এই প্রথম, এই অতি আকাঙ্ক্ষিত, পুত্রের এই অভিনন্দন যেন তাহার মাথায় জয়টীকা পরাইয়া দিল!

দিন দুই জ্বরের ঘোরে বেহুঁস ভাবেই গোপালের কাটিয়া গেল, চোখ খুলিয়া যখন লোকের পানে তাকাইবার তাহার শক্তি ছিল না, তখন বধূবেশিনী মাতাকেই তাহার আপন মা বলিয়া মনে হইত, তাহার পর একটু যখন বোধশক্তি ফিরিয়া আসিল, তখন

রক্তনয়নে ইহার পানে চাহিয়াই উন্মাদের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল, 'দিদি, এ কে? ওকে যেতে বল্‌না, ওকে যেতে বল্‌না, আমি ওকে চাই না।'

উমা ভয় পাইয়া বলিল, 'ও যে মা গোপাল, মা'ইত আজ দুদিন তোর কাছে কাছে রয়েছে, তোর সব ত মা'ই করছে, ওরকম করিস্‌ কেন?'

গোপাল চীৎকার করিয়া উঠিল,—না, না, ও কেন মা হবে, আমি যে আমার ছবির মাকে চাই, আমার নিজের মাকে আমি চাই যে, ওকে আমি মা বল্‌বো না! দিদি, ও দিদি?

মন্দা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া বারান্দায় গিয়া বসিল।

সারারাত গোপাল তন্দ্রার ঘোরে বকিতে লাগিল, কাঁদিতে লাগিল—আমার মাকে এনে দে দিদি। আমার মা কই? তাকে তুই এনে দে ভাই!

উমা কাঁদিয়া বলিল, ওরকম 'মা মা' করিস কেন হতভাগা ছেলে? মা ত কোন্‌ কালে তোকে ফেলে চলে গেছে,—তবু মা, মা।

—মা ত এসেছিল, মা যে আমায় কোলে নিলে, আমার কাছে বস্‌লে যে! কোথায় গেল! দিদি, আমার সত্যিকারের মাকে আমি চাই। আমি আমার নিজের মাকে চাই!

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষণকাল পরে আবার বায়না ধরিল—আমি মার কাছে যাব—

ক্ষুদে দিদিটি তাহার সকল শক্তি, সব কিছু সম্বল দিয়া, প্রাণপণে এই আবদারে ভাইটীকে ভুলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। আর মন্দা কাঠের মত শক্ত হইয়া দরজার বাহিরে বসিয়া সব শুনিতে লাগিল।

গভীর রাত্রিতে পা টিপিয়া টিপিয়া মন্দা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, পাখাখানি হাতে লইয়াই, বিছানার একপাশে উমা কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে, এবং নিতান্তই কেবল অভ্যাসের বশেই হাতের মুঠার ভিতরে পাখাখানি এক একবার যেন নড়িয়া উঠিতেছে,—তা সে রুগ্ন ভাইটীর উপরেই হোক, অথবা তাহার পাশ বালিসটাতেই হোক।

অতি সন্তর্পণে আলোটা তুলিয়া মন্দা শিশুর রুগ্ন মুখখানি দেখিল কি হইয়া গিয়াছে, এমন ছেলেকেও অসহায় করিয়া, মা কেমন্‌ করিয়া পালায়! সংসারে এমন মাও কি সন্তানের কাছে ঋণের দাবী করিবে?—আর ইহার পিতা—? মন্দা সে কথা ভাবিল না, সে কথা ভাবিতে তার ইচ্ছা করে না, সে কথা মনে হইলে মনে কেবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়, তেমন কথা পারতপক্ষে মনে না আনাই ভাল।··· ··· ···আলোটা কমাইয়া দ্বারের বাহিরে রাখিয়া মন্দা শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল।

—মা, মাগো, মা,—

—বাবা মণি,—গোপাল,—

নিদ্রাজড়িত চক্ষুদুটি একটু খুলিয়া, গভীর আশ্বাসে দুখানি হাত বাড়াইয়া গোপাল মন্দাকে

জড়াইয়া ধরিল। পাশে শুইয়া, পুত্রকে বুকে চাপিয়া মন্দার মন বারবার বলিতে লাগিল, 'মাণিক আমার, তোর মা কি তোকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসতো গোপাল ?'

কিন্তু, নিদ্রায় যাহাই হোক, জাগ্রত গোপালের মন ত কিছুতেই একটুও প্রসন্ন হইল না।

৬

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। স্কুলে গিয়া গোপালের দুরন্তপনা দিনে দিনে বাড়িয়াছে বই কমে নাই। বিমাতার প্রতি বিদ্বেষ ভাবটাও কোন রকমেই তাহার মন হইতে দূরীভূত হইতেছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাতার সকল স্মৃতি মন হইতে তাহার ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছিল, কেবলমাত্র অনুমানেই বিমাতাকে মাতার সকল কিছুর অধিকারিণী কল্পনা করিয়া তাহার মনের মধ্যের বিষ দিনের পর দিন কেবলই নতুন নতুন ভাবে পুঞ্জীভূত হইতেছিল।

দোল পূর্ণিমার তিথি,—সারাদিনটা দলে মিশিয়া রং খেলিয়া সন্ধ্যার আঁধারে গোপাল যখন বাড়ী ফিরিল, ঘরে ঘরে তখন আলো জ্বালা হইয়াছে। জ্যোৎস্নার আলোয় হাতের পায়ের অবস্থার পানে চাহিয়া চাহিয়া বহুদিনের অস্পষ্ট একটা স্মৃতি তাহার মনের কোণে কেবলই উঁকি মারিতেছিল।—সেও এমনি এক দোল পূর্ণিমার দিন, সারাদিন রং খেলিয়া, খাবার সময় গোপাল মার কাছে গিয়া দাঁড়াইল; তারপর, ছেলের অবস্থা দেখিয়া মার সেই মৃদু তিরস্কার, সেই সাবান ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, চোখের উপর সব যেন গোপালের পরিষ্কার হইয়া ফুটিতে লাগিল। তার দিন দুই পরেই, কোথা হইতে অলক্ষুণে খোকা ভাইটা মার কোলে আসিয়া পড়িল, এবং দুই তিন ঘণ্টার দাবীতেই, একলা মায়ের সকল স্নেহে ভাগ বসাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে বাড়ী ঢুকিয়াই গোপাল জানালায় মুখ রাখিয়া উজ্জ্বল-আলোক-শোভিত পিতার কক্ষটার ভিতরে তাকাইয়া দেখিল,—কিন্তু একি, ঐ দেয়ালটার গায় যেখানে সুন্দর কাচের ফ্রেম-খানির ভিতর দাঁড়াইয়া তাহার মা, তাঁর স্নিগ্ধ কোমল হাস্যে গৃহখানি আলোকিত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, সেখানে তিনি কোথায় ?—এ যে সেই ফ্রেমখানিতে তাহার পিতার পাশে তাহার নতুন মা বসিয়া আছেন! তবে তাহার মা ?—নিশ্চয় তাহাকে তবে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে! গোপালের মাথা গরম হইয়া গেল, আর সে ভাবিতে পারিল না। মাটি হইতে কুড়াইয়া প্রকাণ্ড এক ইটের টুকরা তুলিয়া ছুড়িয়া সে ফটোটার কাচের উপর মারিল,—এবং সেই মুহূর্তেই যে বিকট ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া সশব্দে রমেশ বাবুর সাধের ফটোখানি ভূমিসাৎ হইয়া গেল,—তাহাতে গৃহকর্তা হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর ঝি চাকরগুলি পর্য্যন্ত কাহারও আর সেঘরে পৌঁছিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইল না, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় গোপালের ছুটিয়া পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই পিতার দৃঢ়মুষ্টিতে বন্দী হইয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিল।

কন্যার হাতে ধূপদানিটি দিয়া মন্দা নত হইয়া তুলসী-তলায় প্রণাম করিতেছিল, মনে কত কামনা, কত আকাঙ্ক্ষা। হায় ভগবান! তোমার সৃষ্ট নারী কি সংসার চালাইবার শুধু একটা কল মাত্র? তাই যদি হয়, তবে তাই হোক, তাই হোক, হে প্রভু, সমস্ত প্রাণ মন দিয়া এ জন্মটা শুধু সংসারের সেবা করিয়া যাই, কোন কর্ত্তব্যে, কোন দিকে এতটুকু যেন স্খলিতপদ না হই হে ভগবান; তারপর, এই জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যেন এ নারীজন্মের শেষ হইয়া যায়।

—মা, ওমা, মাগো, বাবা গোপালকে খুন করে ফেল্লে,—শীগ্গির-শীগ্গির এসো—

কন্যার পেছনে পেছনে অর্দ্ধ-সংজ্ঞা-হারা মন্দা পড়িতে পড়িতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

তারপর দীর্ঘ ক'বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

কাঁচা চুল পাকিবার সঙ্গে সঙ্গে, সবইনস্পেকটার রমেশবাবু ক্রমে ক্রমে বহু সম্মান, বহু উপাধি লাভের পর উচ্চতম পদে বৃত হইয়াছেন। বহু অর্থ বহু দাস-দাসী পরিবৃত হইয়াও মন্দা এখনও তেমনি সংসারের ছোট বড় প্রত্যেকটী কাজ সাধ্যানুসারে আপনি সারিয়া নেয়,—আর তাহার পেছনে পেছনে ঘুরিয়া বেড়ায়—রুক্ষকেশ, থান পরিহিতা ষোড়শী উমা,—মনের ব্যথা গোপন রাখিবার জন্য, তাহার যে অতি সতর্কতার চেষ্টা, তাহা দেখিয়া মন্দা কিছুতেই আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না। এগার বৎসরের নিরুদ্দিষ্ট বালক গোপালের সন্ধান আজিও পাওয়া যায় নাই, সন্ধানের জন্য যে খুব বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না,—তবে-যাক্ সে কথা!—

নতুন দেশে বদলী হইয়া আসিয়া অবধি ডিপুটী পুলিশসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রমেশ বাবুর আর তিলমাত্র অবসর ছিল না। পর পর কয়েকটা বড় রকমের ডাকাতি হওয়াতে সহরের লোক যে ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে ছোট বড় কাহারও প্রাণে আর তিলমাত্র শান্তি ছিল না।

নন্-কো-অপারেশনের ফলে, স্কুল, কলেজ ছাড়িয়া দিয়া, দেশে যে কটি গুণ্ডার সৃষ্টি হইতেছিল, এ কাজ যে তাহাদেরই, তাহাতে কাহারও কোন সংশয় মাত্র ছিল না। লেখা পড়ার দিক হইতে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া, দিন কয়েক খবরের কাগজ বা দিশি সাবান, তেল ইত্যাদি ঘাড়ে বহিয়াও যখন পেট ভরিবার মত ছেলেদের সঞ্চয় কিছু হইল না, তখন এই উপায়ে পেট ভরান ছাড়া তাহাদের আর কোন গতি ছিল না! কিন্তু মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া ইহারা কোন্ সুযোগে যে কাহার কি সর্ব্বনাশ করিয়া যায় সেইটাই শুধু লোকের কাছে অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

সেদিন অমাবস্যার এক নিকষ কালো নিশি, তাহাতে শীতের অকাল সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি নামিয়া পৃথিবীতে এক ত্র্যহস্পর্শের যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। খালের ধারে বস্তির মাঝে, টিনের ছাদ-

বিশিষ্ট ছোট একটি ঘর, টিনের উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া, ঘরের ভিতরে একটা বিকট ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারই মধ্যে একটি মিটি মিটি কেরোসিন প্রদীপের আলোয় দশ বারোজন তরুণ যুবক বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে দলপতির আদেশ শুনিতেছিল।

বহু কথার পর, দলপতি বজ্রনির্ঘোষের স্বরে যে আদেশ জ্ঞাপন করিলেন, তাহা শুনিয়া দলের ভিতর একটা শিহরণ বহিয়া গেল।—খুন—!!—বাপরে!! ডাকাতি করিতে অনেক রকমে, অনেকভাবে, অনেকের অঙ্গেই অস্ত্রাঘাত করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু ইচ্ছাক্রমে অথবা নিয়মানুসারে বাধ্য হইয়া, কেবলমাত্র খুনের উদ্দেশ্যেই খুন! শুম্ভিত যুবকবৃন্দ নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর, একাজ করিতে যাইবে যে, সে যে ফিরিয়া আর আসিবে না, নিঃসংশয়ে এ কথা সবাইত জানে, তবে দলটা অবিশ্যি আরো দিন কয়েকের জন্ম নিশ্চিন্ত হইবে। দলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহসী এবং পালোয়ান বলিয়া যে বিখ্যাত, কে জানে কেন, সেই একটু অধিক পরিমাণে মুসড়িয়া পড়িল। গম্ভীর বজ্রনিনাদে দলপতি আবার হুকুম দিলেন, এই ঝড় এই বৃষ্টির মাঝেই কাজ সারা চাই,—রাত্রি দুইটার সময় খালের এপারে শিকার আসিয়া পড়িবে।

সকলে চুপ করিয়া রহিল, কঠিন কাজ, শক্ত কাজ, দলে মিশিয়া কাজ করা সে একরকম—আর একলা এই কাজে অগ্রসর হওয়া!—কিন্তু প্রাণ নিরাপদ কোনদিকেই ত নহে,—দলের নিয়মানুসারে হুকুম অগ্রাহ্য করিবার শক্তি কাহারও ত নাই!

নিশ্চল, অবশ সেই 'দুই' নম্বর ছেলেটীর পানে দলপতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, একাজের ভার তাহাকেই দিলেন, ছেলেটী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

***　　****　　****　　***

ভোর না হইতেই ডিপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভয়াবহ হত্যার কথা সমস্ত সহরময় ছড়াইয়া সহরটাকে কম্পিত করিয়া তুলিল। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, ছেলেটা পলাইবার যথেষ্ট সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পলায় নাই। মৃতদেহের পাশে সেখানেই নিজে রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছে, এবং তাহার পকেটে এই মর্ম্মে লিখিত একখানি কাগজ পাওয়া গিয়াছে—'বাবা, একদিন তোমার অত্যাচারে ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, সুশিক্ষা কাহাকে বলে, জীবনে তাহা পাই নাই। তাই, এই আমাদের ব্যবসা, এই করিয়াই বৎসরের খোরাক আমরা জোগাই। তুমি আমাদের সে দল ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ, কিন্তু যেখানে আসিয়া একদিন আশ্রয় পাইয়াছিলাম, আজ তাহার মুক্তির জন্মই শুধু এ ভয়ানক কাজ করিলাম। পিতৃস্নেহ কোনদিন পাই নাই, পিতার প্রতি ভক্তিও কোনদিন জন্মে নাই সত্য—তথাপি, তোমাকে মারিয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই—তাই নিজেও চলিলাম।'

কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট হইতে যথাসময়ে উপযুক্ত শোক প্রকাশ করিয়া, উপরোক্ত চিঠি

সমেত, একখানি সমবেদনা পত্র ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বিধবা স্ত্রী এবং কন্যার নিকট পৌঁছিল।

উমা ভয়কম্পিত শুষ্ক স্বরে কহিল 'মা, মা এ কি চিঠি মা?

শায়িতা মন্দা একবার উঠিয়া, চিঠিখানা একবার মাত্র পড়িয়া, আবার কাপড়খানি মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল, চোখে তাহার ভয়াবহ উন্মাদের দৃষ্টি, বুকের ভিতর শুধু একটা তীব্র শূন্যতা।

ভাবাতিশয্য

বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি—যখন তাঁদের যে ঝোঁক চাপে তখন সেই ভাব প্রকাশে তাঁরা আতিশয্য দেখান। চিত্র শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু ছয় প্রকার ভাবের ছয় প্রকার আতিশয্যের ব্যঙ্গ-চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন।



প্রেম পত্র পাঠে—

আগ্রহে নয়ন যখন বিস্ফারিত হয়।

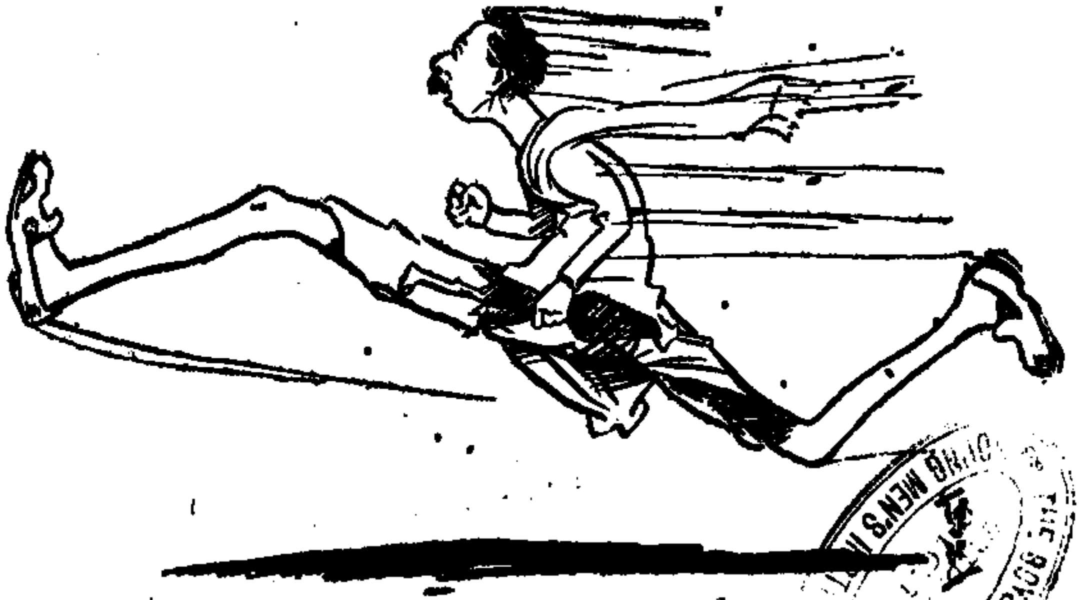


প্রেমসম্ভাষণে—

আজানুলম্বিত বাহু যখন আবেগে প্রসারিত হয় :



লজ্জায়—"সরমে-জড়িত চরণে—"



দীর্ঘ পদক্ষেপ—অফিসের পথে—



পিপাসায়—

যখন বদন ব্যাদান করিয়া
আকণ্ঠ জলপান করে।



দিকপাল—বক্তৃতায়।

নন্-কো-অপারেটার

অনারেবল্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

"এতক্ষণে বাড়ী ফেরবার কথা মনে প'ল ?"

পিসিমা সেলাই রাখিয়া নাসাগ্রে স্থাপিত চশমার উপর দিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রী নাচিতে নাচিতে আসিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—

"আজ কিন্তু বক্‌তে পাবে না। আই বল।"

"আচ্ছা কোথা ছিলি আগে বল্।"

"যদি না বলি ?"—

"তা'হলে বকুনি খেতে হবে।"

"আচ্ছা, কি রকম বকুনি শুনি আগে। বোকা মেয়ে, খুবড়ো মেয়ে—এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে বাইরে থাকা—কোনও ভদ্দর ঘরের মেয়ে—"

পিসিমা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—

"না, তোর সঙ্গে আর পারিনে, ইরা।"

ইরাণী পিসিমার গলা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল :—

"রাখীর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তার বর এসেছে আজ সকালে। তাস খেল্‌তে বসে রাত হয়ে গেল। বকবে না ?"

রাখী ইরাণীর বাল্যসখী। পিসিমা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় সেলাইয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ইরাণী তাহা লক্ষ্য করিল। সেও পিসিমার অনুকরণ করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস টানিয়া বলিল,—

"বর আস্‌বে কবে তাই ভাবছি।"

ইরাণী এমন অভিনয় করিয়া বলিল যে পিসিমাও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

"দূর হ' পাগলী। তোর সব তাইতেই ঠাট্টা ; কবে যে বুদ্ধি-শুদ্ধি হবে, তার ঠিক নেই।"

"আচ্ছা পিসি সত্যি বল, তুমি ঐ কথা ভাবছিলে কি না ?"—

"ভাবছিলাম সে আমার যা মনে লয়। তোর কি ? ইরাণী দেয়ালের বড় আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুতালোকে আরসীতে প্রতিফলিত হইয়া রূপ যেন ঝলমলিয়া উঠিল। ইরাণী রেশমী রুমালের দুইপ্রান্ত উভয় হস্তের অঙ্গুলিতে সযত্নে জড়াইয়া অধরের দুইপ্রান্ত ভাল করিয়া মুছিয়া আবার আরসীর দিকে চাহিল। চোখ যেন আর ফিরে না।

ইরাণীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ ভাবনার ছায়া পড়িয়া মিলাইয়া গেল—যেন স্বচ্ছ নদীর চপল ঢেউএর উপর দিয়া মুহূর্তের জন্য একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া গেল।

"রাখী আমার চেয়ে ফরসা নয়,—না পিসি ?"

পিসিমা আরসীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া পিসিমা কিছুক্ষণ সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। কোনও কথা বলিলেন না।

ইরাণী সহসা হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া অন্যঘরে চলিয়া গেল। পিসিমা ভাবিতে লাগিলেন।

২

ইরাণী এলাহাবাদের সুবিখ্যাত উকীল রাজা কিষণপ্রসাদের কন্যা। কিষণপ্রসাদ ওকালতী ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পৈতৃক জমিদারীও কম ছিল না। বিখ্যাত নাভা-পাতিয়ালা মোকদ্দমায় একপক্ষে থাকিয়া তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি রাজা খেতাব পাইয়া বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বেই ওকালতী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। একমাত্র কন্যা ইরাণীকে রাখিয়া তিনি একদিন বিদায় লইলেন। সংসারে রহিল এক দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী। ইরাণীর বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর।

কিষণপ্রসাদের জ্ঞাতিরাও ছিল; কিন্তু তাহাদের উপর তিনি তাঁহার কন্যা ও জমিদারীর ভার অর্পণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রী তিন-চার বৎসর পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং মৃত্যুকালে তিনি কন্যাকে বড়ই অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া গেলেন।

তাঁহার উইল দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।—তিনি তাঁহার অল্পবয়স্ক প্রতিবেশীর উপর বিষয়ের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। লোকের বিস্ময়ের কারণ এই যে কিষণপ্রসাদের সহিত এই প্রতিবেশী যুবকের তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না—বলিয়াই লোকে জানিত। মোহনলাল যখন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিল, তখন এই কিষণ-প্রসাদই তাহাকে ব্যবসায়ে দাঁড় করাইবার জন্য সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু মোহনলাল হাইকোর্টে বাহির হইতে না হইতে দেশে নন্-কো-অপারেশানের ধূম পড়িয়া গেল। মোহনলালও আদালতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। দেশের আহ্বান সকলেই শুনিল, কিন্তু কেহ সাড়া দিল, কেহ দিল না। যাহারা সাড়া দিল, তাহারা অতীতের মমতা রাখিল না, ভবিষ্যতেরও প্রত্যাশা করিল না, শুধু কর্ত্তব্যের একডাকে, তাহারা নিমিষের মধ্যে সমস্ত ছাড়িয়া প্রস্তুত হইল। তাহাদের মধ্যে মোহনলাল একজন। মোহনলাল দেশে ফিরিয়া সাহেবিয়ানায় কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই; কিন্তু দেশের ডাকে সে আদালত ছাড়িয়া খদ্দর ধরিল এবং একদিন তাহার বাক্স হ্যাটকোট নেকটাই কলার সন্ধ্যাবেলায় যমুনার কূলে জড়ো করিয়া আগুন লাগাইয়া দিল।

কিষণপ্রসাদ একদিন তাহাকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। অনাহারকে যে উপেক্ষা করিতে পারে, জেলখানাকে যে উপহাস করে, মরণকে যে ডরে না, তাহাকে স্বার্থের যুক্তিতর্কজাল বুনিয়া ধরিতে পারা যাইবে কেন? মোহনলাল টলিল না বরং সে তাঁহাকে কড়া কথা শুনাইয়া দিয়া গেল; সারাজীবন 'খএর খাঁ' গিরি করিয়া যে তিনি রাজটীকা পুরস্কার পাইয়াছেন, একথাও বলিতে ভুলিল না।

এই ঘটনার পর হইতেই কিষণপ্রসাদ যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, একবারও মোহনলালকে তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন নাই। লোকে জানিত যে, তিনি মোহনলালের উপর চটিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হঠাৎ যখন সকলে দেখিল যে কিষণপ্রসাদের বিপুল এষ্টেটের একজিকিউটার নিযুক্ত হইয়াছে মোহনলাল, তখন তাহাদের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

মোহনলালও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কতখানি শ্রদ্ধা ও নির্ভর থাকিলে, এইরূপ বিপুল সম্পত্তির ভার একজনের হস্তে তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা ভাবিয়া মোহনলাল গৌরব বোধ করিল। তিনি যে নন্-কো-অপারেশনের পূর্ব্বে মোহনলালকে ব্যবসায়ে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও সে ভুলিয়া যায় নাই। সুতরাং এই গুরুভার সে কর্ত্তব্যের অনুরোধে, কৃতজ্ঞতার খাতিরে গ্রহণ না করিয়া পারিল না। কিন্তু সে মনে মনে সংকল্প করিল যে নিজের জন্য একটী পয়সাও ন্যস্ত সম্পত্তি হইতে সে লইবে না। মোহনলালের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু সে যখন হেলায় নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে তখন সে পরের অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না।

৩

রাজা কিষণপ্রসাদ কতকটা সেকালের লোকের মত ছিলেন। কন্যাকে পণ্ডিতের দ্বারা কিছু কিছু সংস্কৃত ও মুন্সীর দ্বারা উর্দ্দু লেখা পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ করিয়াছিলেন। মোহনলাল বিলাতী শিক্ষার পক্ষপাতী, কাজেই নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। পুরাতন কর্ম্মচারীরা চক্ষু কপালে তুলিয়া, বারবার ... পাকাইয়া, পরস্পর জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টির বিনিময় করিল। খদ্দরে মণ্ডিত, গান্ধিটুপী-ভূষিত স্বদেশী-গন্ধ-মোদিত এই যুবকের মধ্যে পুরা দস্তুর সাহেবিআনার ভাব দেখিয়া তাহাদের তাজ্জব লাগিয়া গেল। মোহনলাল রাজকুমারীর জন্য একটি মেম নিযুক্ত করিল। সে ইংরাজী শিখাইত, সেলাই ও গান শিখাইত এবং ইরাণীর সঙ্গে ব্যাডমিণ্টণ টেনিস্ প্রভৃতি ইংরাজী খেলা খেলিত। পিসিমা এই বন্দোবস্ত খুব পছন্দ করিতেন এবং নিয়ত মেম সাহেবের কাছে বসিয়া সেলাইটিও তিনি কতক আরম্ভ করিয়া লইয়াছিলেন। সে জন্যও বটে, স্বভাবের গুণেও বটে, তিনি একেবারেই মোহনলালের ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন।

কর্মচারীরা প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, সূক্ষ্ম-বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রবীণ কিষণপ্রসাদের অবর্তমানে এই অপরিপক্ব তরুণকে মনিব করায়ত্ত করা অতি সহজ হইবে। কিন্তু তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে, যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার স্বার্থের কামনা বর্জ্জন করিয়া শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আঁটিয়া উঠা কঠিন। কিষণপ্রসাদের উইলে মোহনলালের জন্ত পারিশ্রমিকের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহার পদ ও মেহনতের হিসাবে উপযুক্ত মাসোহারা লইতে পারিবেন এরূপ নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু কর্মচারীরা দেখিল, যে এই নব্য অভিভাবকের দৃষ্টি অর্থের দিকে একেবারেই নাই। মাসের পর মাস সে খাটিয়া যায়, একটি কপর্দ্দকও নিজের জন্ত লয় না।

যাহারা কিষণপ্রসাদের সম্পত্তির অভিভাবক হইলেও হইতে পারিত, তাহারা যখন দেখিল যে, এই ছোকরা পয়সা না লইয়াই এত বড় একটা জমিদারীর কাজ চালাইতেছে তখন তাহারা ভাবিল, বোধ হয় কিষণপ্রসাদের কন্তার প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে এবং তার সঙ্গে তাহার রাজ্যটিও যৌতুক পাইবার সে আশা রাখে; প্রকাশ্রেও তাহারা এ কথা বলিতে ক্রটী করিল না।

কিন্তু মোহনলাল সে বালিকার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিত না। প্রয়োজন হইলে সে অবাধে অন্দর মহলে যাতায়াত করিতে পারিত; কেন না এই বাটীতেই সে ছেলেবেলা হইতে বাস করিতেছে। ইরাণীর সহিত বিশেষ দেখাশুনা না থাকিলেও তাহার পিসিমা মোহনলালকে বাল্যকাল হইতেই জানিতেন। তাহা হইলেও সে অন্দরে বড় আসিত না। কোনও প্রয়োজন হইলে, কর্মচারীর দ্বারা পিসিমাকে সংবাদ পাঠাইত এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিত। কিন্তু এরূপ প্রয়োজন সে বড় একটা ঘটিতে দিত না। বাহিরের আফিস ঘরে বসিয়াই সে বৈষয়িক কাজ কর্ম দেখিয়া চলিয়া যাইত।

ইরাণীর কোনও প্রয়োজন হইলে সে লালাজীর নিকটে পিসিমার দ্বারাই বলিয়া পাঠাইত। সে তাহাঁর নিজের খেলাধূলা, লেখা-পড়া লইয়াই থাকিত। লালাজীর নিকট কোনও প্রয়োজন জানাইতে সে বড় লজ্জা বোধ করিত।

৪

এই ভাবে প্রায় চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মোহনলাল সকালে সন্ধ্যায় রাজ-এষ্টেটের কাজ করে; দিনের বেলা জাতীয় বিত্যালয়ে ঘণ্টাকতক পড়াইয়া যাহা কিছু পায়, তাহার দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সংসারে তাহার মা ও একটি অবিবাহিতা ভগ্নী ব্যতীত আর কেহ নাই; কাজেই অনায়াসে একরূপ চলিয়া যাইত। ইচ্ছা করিলে যে মোহনলাল আইন ব্যবসায়ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত তাহা অনেকে খুব জোর করিয়া বলিত। কিন্তু মায়ের সনির্ব্বন্ধ অনুনয়েও সে বিদেশীর আদালতে যাইতে স্বীকার করিল না। যদি কখনও

স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, দেশীয় ধর্ম্মাধিকরণ হয়, তখন দেখা যাইবে। সেরূপ কোনও শুভদিনের আগমনের আশু সম্ভাবনা মোহনলালের মাতা না দেখিলেও মোহনলাল প্রাণপণে বিশ্বাস করিত। সে কথা উঠিলে ঈষৎ হাসিয়া শুধু ইহাই জানাইয়া দিত যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার ক্ষমতা কোনও মানুষেরই নাই। যাহা হউক, মোহনলাল মাতার আশা চরিতার্থ করিতে কোনরূপেই প্রস্তুত হইল না।

আর একটি বিষয়ে সে মাতার মতে সায় দিতে পারে নাই। দেশের সেবা করিতে হইলে যে অবিবাহিত থাকিতে হয়, ইহা তাহার মাতা কোনও মতেই বুঝিতে চাহিতেন না। কিন্তু মোহনলালের অবস্থার কথা মনে করিয়া তিনি চুপ করিয়া যাইতেন। পুত্র যে দেশের জন্য স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতেন। এই অবস্থার মধ্যে বধূ ঘরে আনিয়া তাহাকে এবং ভবিষ্যতে তাহার যে সকল সন্তান হইবে, তাহাদিগের উপযুক্ত ভাবে ভরণ-পোষণ করিবেন কি প্রকারে? চরকা কাটিয়া নিজের জীবিকা সংগ্রহ করিতে কোনও পুত্র-বধূকে প্রাণ ধরিয়া বলা যায় না। মোহনলাল অবিবাহিতই রহিল। স্বদেশ-সেবাব্রতধারী হেলায় যৌবনের জল-তরঙ্গ পার হইয়া গেল। বিশ্ব যে তাহার চির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-সম্ভার লইয়া তাহার হৃদয়দ্বারে কবে উপস্থিত হইল, কবে যে নবপুষ্পপল্লবে, বর্ণে, সঙ্গীতে ধরা ভরপুর হইয়া উঠিল, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াও করিল না।

রাজবাড়ীতে দপ্তরখানায় যখন সে কাগজপত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকিত, তখন তাহার নিকটে যাইতে প্রবীণ কর্ম্মচারীরাও সাহস করিত না। সে একে একে যখন প্রধান আমলাদিগকে ডাকিয়া কাজের নিকাশ লইত, তখনই তাহারা আবশ্যকমত সমস্ত বিষয় পেশ করিয়া লইত। নিতান্ত আপত্তিকর না হইলে, সে কোনও কাজে বড় একটা প্রতিবাদ করিত না। বিলাতী কাপড় সম্বন্ধেই সে মঞ্জুরী দিতে কেমন কুণ্ঠিত হইত; অন্য কোনও খরচপত্রের সম্বন্ধে কেবল অমিতব্যয়িতা নিবারণ করিয়াই সে ক্ষান্ত হইত।

একদিন দেওয়ানজী বলিলেন যে রাজকুমারী কতকগুলি লেসের পরদার ফরমাস দিয়াছেন। তাহার দাম দিতে হইবে। মোহনলাল বিষম বিপদে পড়িল; বিলাতী লেসের পরদা তাহাকে না বলিয়া কে ফরমাস দিল? এখন তাহা মঞ্জুর করিবে কে? মোহনলালের মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখিয়া প্রবীণ কর্ম্মচারী আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু এ সংবাদ ইরাণীর পাইতে বিলম্ব হইল না। পরদা তখন কেনা হইয়া গিয়াছে; আর ত ফিরাইবার উপায় নাই। আর ফিরাইবেই বা কেন? সে ত আর বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় নাই। তাহার পিতার অর্থ সে ব্যয় করিবে, তাহাতে অন্যের কি আপত্তি থাকিতে পারে, ইহা সে বুঝিল না।

তবে ইহা ও ঠিক যে, মোহনলাল এ সংসারের তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিলে, ইহা একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, বিলাতী বস্ত্র এ বাড়ীতে আর চলিবে না। ইরাণীও আবার

সেই ব্যবহার মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু এখন সে বড় হইয়াছে, দু'চার জন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিতে হইতেছে। কাজেই ড্রয়িংরুম একটু না সাজাইলে ভাল দেখায় কি? রাজা কিষণপ্রসাদের আমলের যে ক্রেটনের পরদা ছিল, তাহার রঙ জ্বলিয়া গিয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছে। সুতরাং ইরাণী নিজেই দরজি ডাকিয়া লেস্ কার্টেনের ফরমাস দিয়াছিল। ইহাতে এমন কি অন্যায় হইতে পারে? সে স্থির করিল একদিন দাদাজীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিবে।

ইরাণী যে দিন রাত করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল, সে রাত্রিতে তাহার ভাল ঘুম হইল না। পিতার মৃত্যুর পর হইতে একদিনও সে কোনও বিশেষ চিন্তার মধ্যে পতিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত কোনও দিন কোনও অভাব তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। অভাব উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সুতরাং কোনও বিষয়েই তাহাকে ভাবিতে হয় না। আজ তাহার মনে হইল যেন হঠাৎ চিন্তা-রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল, কোথা হইতে চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া স্রোতের মত তাহার মনকে কেবলই দোলা দিতে লাগিল। পূর্ব্বে তাহার মনে হইত জীবনে কোনও অভাব নাই, এমনি করিয়া হাসিয়া খেলিয়া পাল তুলিয়া নাচিতে নাচিতে জীবনের তরীখানি ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু আজ এ কি হইল? কি যে বিরাট অভাব তাহার সম্মুখে অনন্ত ক্ষুধা লইয়া উপস্থিত হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। কেবল মনে হইতে লাগিল, তাহার জীবন শূন্য—শূন্য সব শূন্য। রাখী কত সুখী! রাখীই সুখী। রাখী এলাহাবাদের ধনী-উকীল জগৎ নারায়ণের কন্যা, ইরাণীর সমবয়সী, উভয়েরই বয়স ১৭ বৎসর বাল্যকাল হইতেই উভয়ের খুব ভাব, অনেক বিষয়েই তাহাদের মধ্যে সমতা ছিল। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে রাখীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে সে শ্বশুর গৃহে গিয়াছিল। সম্প্রতি স্বামীকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদ ফিরিয়াছে।

আজ্ সে তাস খেলিতে বসিয়া দেখিয়াছে, রাখীর স্বামী রমাশঙ্কর রাখীকে কত ভালবাসে! সে নানা ছলে রাখীর হাতের তাস কাড়িয়া লইয়াছে; তাস কাড়িতে গিয়া কাণের দুল ধরিয়া নাড়িয়া দিয়াছে, ওড়না উড়াইয়া দিয়াছে; খেলিতে পারে না বলিয়া মিছামিছি তাস ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিয়াছে—আরও কত কি! রাখীও মাঝে মাঝে খেলা ভুলিয়া, তাসের উপর দিয়া শুধু তাহার স্বামীর দিকেই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। এ সকলই বার বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর কোথা হইতে এক একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার তরুণ বক্ষ ব্যথিত করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল।

ইরাণী প্রভাতে উঠিয়া গত রজনীর চিন্তার রাশিকে বিদায় করিতে চেষ্টা করিল। আবার সে প্রভাত সূর্য্য-কিরণের মত আনন্দের লহরী তুলিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে যেন আর একটুও অন্ধকার কোথায়ও নাই, এমনিভাবে সে তাহার ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিল।

গত সন্ধ্যায় সে রাখীর বাড়ীতে খাইয়া আসিয়াছে। আজ তাহার ইচ্ছা হইল যে, সে রাখী ও তাহার স্বামীকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়। পিসিমাও তাহাতে সায় দিলেন। তবে তাহার ইচ্ছাক্রমে নিমন্ত্রিতের ফর্দ কিছু বাড়াইতে হইল। কিষণপ্রসাদের মৃত্যুর পর আমোদ উৎসব একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, বলিলেও হয়। পিসিমা দেখিলেন ইরাণী যখন ইচ্ছা করিয়াছে, তখন আরও কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা মন্দ হইবে না। পিসিমা যাহাদের নাম করিলেন, তাহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ইরাণীর পরিচিত। ইরাণী লালাজীকেও বলিবে স্থির করিল।

সকলকেই যথারীতি পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইল। কিন্তু মোহনলালকে পত্র দেওয়া ইরাণী সঙ্গত বোধ করিল না। কারণ মোহনলাল রাজপরিবারের মধ্যেই একরূপ গণ্য।

নিমন্ত্রণের পূর্ব্বদিন মোহনলাল যখন দপ্তরে বসিয়া কাজ করিতেছিল, তখন ইরাণী সান্ধ্য-ভ্রমণ হইতে একেবারে সেখানে গিয়া হাজির হইল। প্রবীণ কর্মচারীরা রাজকুমারীকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মোহনলাল বসিয়াই অভ্যর্থনা করিল।

বহুদিন মোহনলাল ইরাণীকে এত নিকটে দেখে নাই। সে যে এতবড় হইয়াছে, ইহাও তাহার নিকট নূতন বোধ হইল। সে গৃহে প্রবেশ করিলে মনে হইল যেন হঠাৎ রুদ্ধ-গৃহের জানালা খুলিয়া দেওয়াতে একরাশি চন্দ্রকিরণ জড়াজড়ি করিতে করিতে ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার সে আনন্দ-চপল স্বাস্থ্য ঢল ঢল শ্রীতে মোহনলাল চকিত হইল। কিন্তু সে বাহিরে কঠোরতা অবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

"তোমার কি কিছু কথা আছে? থাকে ত বল।"

ইরাণী বলিল "না কাজের কথা কিছু নেই। এই কাল রাখী ও তার স্বামীকে সন্ধ্যায় খেতে বলেছি, আপনিও খাবেন।"

মোহনলাল সোজা হইয়া বসিয়া বলিল :—

"না, আমি ত খেতে পারব না।"

"কিন্তু খেতেই যে হবে লালাজী।"

"না, আমাকে মাপ কর, ইরা। আমি কিছুতেই পারব না।"

"কেন, আমি জানতে চাই। আপনার কাল স্থবিধে না হয়, আমি কালকার দিন পরিবর্ত্তন করে অন্তদিন করছি—যেদিন আপনার স্থবিধে হবে—"

"না—না—তা কেন? আমি কোনও দিন খেতে পারব না—"

"তার কারণ আমি জানতে পারি কি?" ইরাণীর চক্ষু অকস্মাৎ কেন ছল ছল করিয়া আসিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

"কারণ? আচ্ছা, কারণ অন্তদিন বল্‌বো।"

"না, আজই বল্‌লে কি ক্ষতি?"

মোহনলাল এবার একটু ব্যঙ্গেরভাবে বলিল :

"তোমার ঐ লেস্ ঝুলানো বিলাতী আসবাবে সাজানো ড্রইং রুমে আমার এ খদ্দরের পায়জামা খদ্দরের কুর্ত্তা খদ্দরের টুপী মানাবে কি ?"

লেসের পরদার কথা শুনিয়া ইরাণীর মনে তর্কের ভাব জাগিয়া উঠিল। সে বলিল :—

"লেস্ পরদায় এমন কি দোষ আছে ? আমরা ত দেশী জিনিস পেতে বিলাতী ব্যবহার করিনে।"

"কিন্তু লেস পরদা না হলে যে সভ্যসমাজ একবারে অচল হয়ে যায়, তাও ত জানিনে।"

"না অচল হবে কেন ? তবে স্বরাজ আর আপনাদের মধ্যে শুধু ঐ একটু লেসের পরদা ব্যবধান—এমন যদি হয়—"

মোহনলাল সম্মুখস্থ পুস্তক সজোরে বন্ধ করিয়া উঠিল। বলিল :

"না—ও তর্কে কাজ নেই। আমি যেতে পারব না।"

মোহনলালের দৃপ্ত-মুখে নীল কাচের মধ্য হইতে যে আলো পড়িয়াছিল, তাহাতে তাহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইল। ইরাণী চমকিয়া উঠিল। সে একটু হাসিয়া বলিল :

"সে হবে না। আমি ড্রয়িংরুমে একটুও বিলাতী আসবাব রাখবো না। আপনাকে আসতেই হবে।

"পরদাগুলি কি হবে শুনি ? কুশন চেয়ারগুলি কোথায় যাবে শুনি ?"

"যমুনার জলে—" বলিয়া ইরাণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। মোহনলাল আবার কাজে মন দিল। ইরাণী বাহিরে কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া আবার ঘরে গেল। মোহনলালের টেবিলে কনুইয়ে ভর দিয়া দুইহাতে মস্তক রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মোহনলাল হিসাবের খাতা হইতে চক্ষু তুলিল না; ইরাণী একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। এমন শান্ত, অথচ এমন তেজস্বী; এত বলিষ্ঠ, অথচ এত ক্ষমাশীল। এত গুণী, অথচ এত নিরভিমান। এত সুন্দর, অথচ এত উদাসীন। কি আশ্চর্য্য !

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া মোহনলাল হাসিয়া ফেলিল। বলিল :

"আবার কি মতলব ?"

"কাল আসবেন ত ?"

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে ?"

সে স্বরে একটুও আগ্রহ প্রকাশ পাইল না। ইরাণী বলিল :

সত্যি, আমি বিলাতী জিনিস আজ থেকে বর্জ্জন করলাম। আপনি বিশ্বাস করছেন ত ?"

"কেন, আমার জন্যে ?"

"না—হাঁ আপনার জন্য। আপনি আমার অভিভাবক; আপনি বাবার মৃত্যুর পরে আমার জন্যে যা করেছেন, তাতে শুধু আপনারই জন্যে যদি বিলাতী বর্জ্জন করি তা হলে কি অন্যায় হয় ?—"

"না, তা না হতে পারে। তবে আমি আরও খুসী হ'ব সেইদিন, যেদিন তুমি আপন ইচ্ছায়—কারও দিকে না তাকিয়ে—শুধু দেশের জন্তে বিলাতী পরিত্যাগ করতে পারবে—"

"আচ্ছা—তা'হলে আমি এখন যাই—"

মোহনলাল অম্লান বদনে বলিতে পারিল না "যাও।" আজ এ মেয়েটা—একি এক নূতন আলো লইয়া আসিয়াছে! এ চলিয়া গেলে ভাল লাগে না কেন? ইরাণী যখন চলিয়া যাইতেছে, তখন মনে হইল, ইহাকে ডাকিয়া আর কোনও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয় না? মোহনলাল খোলা বইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অক্ষগুলি একটা আর একটার স্কন্ধে চাপিয়া শুধু তিনটি অক্ষরে দাঁড়াইল ই-রা-ণী।

ইরাণী দরজা পার হইবার সময় একবার ফিরিল। উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"লালাজী, দেখুন হারমোনিয়াম রাখতে দোষ আছে কি? রাখী গান গাইতে ভালবাসে।"

মোহনলাল হাসিয়া বলিল "না।"

আম্‌লারাও মনে মনে হাসিল—ইরাণীও হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

৬

পরদিন সন্ধ্যার পরে নিমন্ত্রিতেরা আসিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা যদিও বেশী ছিলনা, তথাপি রাজকুমারীর ইচ্ছায় রীতিমত উৎসবেরই আয়োজন হইয়াছিল। বাহিরের ফটকে রোশনচৌকী বসিয়াছিল, ফটক হইতে গাড়ী বারান্দা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে তোরণের মত প্রস্তত করিয়া পত্রপুষ্পে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মধ্যে চীনা লণ্ঠনের ভিতর লাল নীল রঙের বৈদ্যুতিক বাতি ঝুলানো হইয়াছিল। শুভ্র মার্বেলের বারান্দায় নানা জাতীয় পাম ও এরিকার টব; সেগুলির সবুজ পাতার উপর উজ্জল আলোক পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

রাখী ও তাহার স্বামী আসিল। মহাকলরবে ইরাণী তাহাদিগকে আনিয়া ড্রয়িংরুমে বসাইল। মোহনলাল তাহার ভগ্নীকে লইয়া আসিল। মোহনলালের ভগ্নীও প্রায় ইরাণীর সমবয়সী। ইরাণী তাহাকেও পত্র দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। মোহনলাল ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, লেসের পরদা নাই; তাহার স্থলে মূল্যবান কাশ্মীরের রেশমের কাজ করা কাশ্মীর গরদ ঝুলানো হইয়াছে। ড্রয়িংরুম হইতে সমস্ত চেয়ার বিদায় করা হইয়াছে। পুরাতন পুরু পারস্ত দেশীয় কার্পেটে গৃহতল মণ্ডিত। তাহার উপর কতকগুলি খদ্দরাবৃত তাকিয়া; পূর্ব্বে প্রাচীর গাত্রে যে সকল বিলাতী ছবি ছিল, তাহাও দূরীভূত হইয়াছে, তাহার স্থলে কতকগুলি পুষ্পগন্ধে গ্রথিত মালা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মোহন-লাল ইরাণীর রুচির প্রশংসা না করিয়া পারিল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে একখানি

সুসজ্জিত ঘরের সমস্ত ওলট পালট করিয়া তাহাকে এইরূপ অভিনব সৌন্দর্য্য প্রদান করিতে যে পারে, তাহার রুচি ও কল্পনাশক্তির তারিফ না করিয়া পারা যায় না।

নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে সকলেই অল্পবয়স্ক, সকলেই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। প্রাচীন প্রথার পক্ষপাতী মুরুব্বি ধরণের লোককে ইচ্ছা করিয়াই বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ইরাণীর শিক্ষা-দীক্ষা মামুলী ধরণে হইলে এরূপ সম্মিলন সম্ভব হইত না। রাজা কিষণপ্রসাদের সময় হইতেই বিলাতী চালচলন অল্পস্বল্প চলিতে থাকে। মোহনলালের অভিভাবকতায় ও ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীর প্রভাবে রাজকুমারীর চালচলন অনেকটা বাধাশূন্য হইতে পারিয়াছিল। পিসিমার অনুরোধে ইরাণী সেদিন একখানি পিঙ্ক রঙের পারসী শাড়ী পরিয়াছিল। পিসিমা অনেক যত্নে তাহার কেশ-বিন্যাস করিয়া দিয়াছিলেন। কয়েকগাছি কুঞ্চিত কেশ অলস ভাবে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বাতাসে ঈষৎ দুলিতেছিল। পিসিমা তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া পুলকে, গর্ব্বে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন; আর এক এক বার কুমার জওলাপ্রসাদের দিকে সতৃষ্ণভাবে চাহিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা মৌলির রাজার একমাত্র পুত্র জওলাপ্রসাদ ইরাণীর রূপে মুগ্ধ হয়। বহুদিন হইতে উভয় পরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য থাকাতে পিসিমার মনে একগাছি ভাবী-পরিণয় সূত্র-গ্রথিত মাল্য রচিত হইতেছিল। জওলা-প্রসাদও যে ইরাণীর রূপে বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হইতেছিলেন, তাহা তাঁহার চোখে মুখে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। ইরাণীর চক্ষু দুইটি দেয়ালের বড় বড় আয়নার মধ্যে এক এক বার সকলের চক্ষু যাচাই করিয়া লইতেছিল।

ওস্তাদজি সরঙ্গ বাজাইয়া পুনঃ পুনঃ সেলাম করিয়া রাখিয়া দিলেন। সকলেই বাহবা দিল। মোহনলাল একমনে শুনিতেছিল, সে বাহবা দিতেও ভুলিয়া গেল।

ওস্তাদজির অনুরোধে ইরাণী সরঙ্গ লইল, কিন্তু হাত খুলিল না। সুরের মীড় উঠিল না; ইরাণী যন্ত্র রাখিয়া উঠিয়া গেল। সে এতক্ষণ হাল্‌কা একটি হাওয়ার মত সমস্ত ঘরে বেড়াইতেছিল; শত দীপের আলোকচ্ছটা তাহার স্ফুট চম্পকবর্ণে পড়িয়া বিচ্ছুরিত হইতেছিল। কিন্তু ক্রমেই তাহার মনে যেন একখণ্ড মেঘ উঠিয়া সেই পুলকাকুল উৎসবের রজনীকে মলিন করিয়া দিতেছিল। সকলের অনুরোধে রাখী গান গাহিল—বসন্তের কোকিল যেন আনন্দের পঞ্চমস্বর ছুটাইয়া দিয়া আকাশ বাতাস ভরিয়া দিল।

রাখীর অনুরোধে ইরাণীকেও হারমোনিয়ামে বসিতে হইল। তাহার যে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল না; তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। শুধু শিষ্টাচারের অনুরোধেই সে গান করিতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু মনে হইল যেন তাহার কণ্ঠস্বরে কত শ্রান্তি; তাহার মনে কতই বিষাদ! তবুও সে গাহিল :—

উধোজি করমকী বাত নেয়ারি।
মন মোরা চাহে মোহন মিলনকো—
করম না দেত উবারি।

শ্রীরাধিকা কবে উদ্ধবজিকে মনের বেদনা জানাইয়া বলিয়াছিলেন,যে মরমের কথা স্বতন্ত্র; মিলনের জন্য চিরপিপাসিত চিত্ত কর্ম্মের বিপাকে বাঞ্ছিতের সহিত মিলিতে পারিতেছে না— আর সুরদাসের সেই পদে গাহিতে আজ রাজকুমারী ইরাণীর মন এমন করিয়া সুরের মধ্য দিয়া কেন কাঁদিয়া উঠিল, তাহা কেহই বুঝিল না। ইরাণী যখন গান সমাপন করিল, তখন কি যেন কিসের মোহে সকলেই নিস্তব্ধ হইয়াছিল। কেহ একবার বলিল না যে 'সুন্দর'। মোহনলালের ভগ্নী রেবা উঠিয়া গিয়া শুধু ইরাণীর স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিল।

৭

সেদিন হইতে ইরাণীর জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিল। এতদিন যে নিশ্চিন্তভাবে আনন্দের নির্ঝরিণীর মত জীবনপথে ছুটিয়া চলিয়াছিল, সে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িল। পিসিমা লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন, তাহার ত কোনও হাত নাই। তাঁহার মনোনীত কুমার জওলাপ্রসাদ দুই একবার ইরাণীর সহিত মিত্রতা করিতে আসিলেন। কিন্তু ইরাণী শিষ্টাচারের বিনিময় মাত্র করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। পিসিমা কুমারকে বলিলেন, "বাবা কিছুদিন হইতে ইরাণীর শরীর ভাল যাইতেছে না।"

কুমার আশা ছাড়িলেন না। তিনিও মনে করিলেন যে ইরাণীর অসুস্থতাই তাহার মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতার বাধা জন্মাইতেছে। কিছুদিন পরে তিনি রীতিমত ঘটক পাঠাইলেন। ঘটক মোহনলালের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

মোহনলাল দেখিল যে ইরাণীর যোগ্য পাত্রই জুটিয়াছে; সুতরাং সে পিসিমার সহিত পরামর্শ করিতে গেল। কিন্তু পিসিমা কোনও প্রকার আগ্রহ দেখাইলেন না। মোহনলাল ভাবিত হইল। অবশেষে সেও ইরাণীর অসুখের দোহাই দিয়া কিছু সময় লইল।

বাস্তবিকই ইরাণীর শরীর ভাল যাইতেছিল না। রমণীর সুখ দুঃখ রমণী যেমন বুঝে, এমন আর কেহ নহে। কাজেই ইরাণী নিজে তাহার শরীরের অবস্থা লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই পিসিমা বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার শরীর ঠিক পূর্ব্বের মত নাই।

সেই উৎসবের পর হইতে ইরাণী মাঝে মাঝে মোহনলালের অফিস ঘরে গিয়া হাজির হইত। মোহনলালের কাজের কিছু ক্ষতি হইলেও সে যে তাহা পছন্দ করিত, এ কথাটি স্বভাবচতুরা নারী বুদ্ধির অগোচর রহিল না। মোহনলাল এই সুযোগে তাহাকে বিষয়কর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইরাণীর বয়স সতের বৎসর পার হইয়াছে, আর কিছুদিন পরেই তাহাকে নিজের বিষয়ের ভার নিজস্কন্ধে লইতে হইবে। এখন হইতে তাহার কর্ত্তব্য—সমস্ত জানিয়া শুনিয়া লওয়া। প্রবীণ কর্ম্মচারীরাও একথায় সায় দিলেন।

একদিন মোহনলাল বিশেষ উৎসাহের সহিত ইরাণীকে বিষয়কর্ম্ম বুঝাইয়া তাহাকে সে সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে বলিল। ইরাণী আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিবার পরে শুধু উত্তর করিল:

"আমি কি জানি ?"

মোহনলাল বলিল :—

"তোমাকেই ত জান্তে হবে আর দিনকতক বাদে"—

"কেন, আমাকেই যে জান্তে হবে, তার মানে কি ?"

"আমি আর-ক'মাস আছি বইত নয়! শেষে ত তোমাকেই এ সকল বুঝে সুঝে করতে হবে"—

"আপনি কোথায় যাবেন লালাজী ?"

"আমি যেখানেই যাই—তোমার এই বিষয়ের ভার ত আমাকে নামাতেই হবে"—

"ওঃ—সে আপনি পারবেন না"—মোহনলাল হাসিল। কিন্তু সে হাসিটুকু বড়ই ম্লান। সে তাহার মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল :—

"না ইরা ; সে হবে না। তোমাকেই সব বুঝে নিতে হবে"—

ইরাণী বাধা দিয়া বলিল :—

"না—না, সে আমি পারব না। লালাজী আপনি গেলে এ বিষয়সম্পত্তি সব উচ্ছন্ন যাবে। আমি কি পারি, এত বড় বিষয় সামলাতে ?"—

"তা কেন ? তোমার যিনি ম্যানেজার থাকবেন, তিনিই সব করবেন, তোমাকে শুধু সমস্ত বুঝে সুঝে মতামত দিতে হবে, কারণ এর যা ভালমন্দ তার জন্যে তুমিই ত দায়ী হবে"—

ইরাণী ভাবিতে লাগিল। লালাজীকে ম্যানেজার হইতে বলিলে হয় না ? কিন্তু সে ভাবিয়া দেখিল যে লালাজীকে তাহার বেতনভোগী কর্মচারী হইতে বলিলে, তাঁহার অসম্মান করা হয়। সে ধীরে ধীরে মোহনলালের গৃহ হইতে চলিয়া আসিল। কিছুদিন আর তাঁহার নিকটে গেল না।

মোহনলাল তাহার কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে দরজার দিকে চাহিত। তাহার একান্ত চেষ্টা ছিল—কাজের মধ্যে আপনাকে নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে। কিন্তু মন যে কখন লুকোচুরি খেলিয়া বেড়ায়, সে তাহা ধরিতে পারিত না। মনের অবাধ্যতা শাসন করিতে গিয়া সে সময়ে সময়ে দেখিত, যে সেই অবাধ্যতাটুকুই বড় মিষ্ট।

একদিন বড়ই অন্যমনস্কভাবে সে বাড়ীতে গেল। কয়েকদিন ইরাণী রোজই আফিসে আসিয়াছে ; কোনও দিন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তাহার সহিত কথা কহিয়া গিয়াছে, কোনও দিন মোটরের শব্দে তাহার কক্ষ নিনাদিত করিয়া তাহাকে কাগজপত্রের কবল হইতে সবলে জানালায় টানিয়া লইয়া আলাপ করিয়াছে। কোনও দিন সান্ধ্যভ্রমণের পর ফিরিবার মুখে আফিস ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে নানা প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। সে যখনই ঘরে প্রবেশ করিত, তখনই যেন আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইত। কর্মচারীদিগকেও ইরাণী নানাসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া তাহাদের কর্মজীবনের ভার হাল্কা করিয়া দিত। কিন্তু যেদিন সে আসিত না, সেদিন মোহন-

লাল কিছু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত। আজ ইরাণী আসে নাই, কাজেই মোহনলালের মনে প্রফুল্লতা নাই।

মোহনলালের ভগ্নী তাহা লক্ষ্য করিল। সে আজ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল :—

"দাদা, ইরা তোমায় ভালবাসে।"

মোহনলাল চমকিত হইয়া বলিল :—

"দূর পাগলী, ইরা আমায় ভালবাসতে যাবে কেন? জওলাপ্রসাদের সঙ্গে যে তার বে'র, সম্বন্ধ হচ্ছে।"

রেবা চুপ করিয়া রহিল। মোহনলাল ভাবিতে লাগিল মুখে কি চিন্তার ছাপ পড়ে? রেবা এমন করিয়া মনের কথা জানিল কিরূপে? সত্যই ত মোহনলাল ইরার কথাই ভাবিতেছিল।

৮.

সত্যই কমৌলির রাজকুমার জওলাপ্রসাদ ইরাণীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম ইরাণীর শরীর ভাল নহে, বিবাহ-প্রস্তাবের এই সময় নহে—ইত্যাদি নানা প্রকার অজুহাতে তিনি নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু শেষে কোনও প্রকার আশাজনক উত্তর না পাইয়া, তিনি মোহনলালের গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই মোহনলালের মাতার সহিত কমৌলির রাজপরিবারের সম্পর্ক ছিল। জওলাপ্রসাদ এই সম্পর্ক ধরিয়া মোহনলালের বাড়ীতে প্রায়ই আসিতে লাগিলেন। মোহনলাল কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল! কারণ ইরাণীর পক্ষে এরূপ সম্বন্ধ যে খুবই বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না! অথচ সে পক্ষে তেমন আগ্রহও সে দেখিতে পায় নাই। কুমারকে যে কি জবাব দিবে, ভাবিয়া পাইল না।

মোহনলাল একদিন এ বিষয়ে ইরাণীর নিজের মত কি জিজ্ঞাসা করিবে সংকল্প করিল। কাজটি যে সহজ নহে, তাহা মোহনলাল জানিত; সেইজন্যই অন্য কাহাকেও এ ভার দিতে সাহস করিল না। পিসিমার সহিত পরামর্শ করিয়া সে স্থির করিল যে ইরাণীকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করা ভাল। পিসিমাও বলিলেন যে মোহনলাল স্বয়ং এ বিষয় ইরাণীর সহিত কথা কহিলে ভাল হয়।

এই স্থির করিয়া মোহনলাল একদিন সকাল সকাল জাতীয় বিদ্যালয় হইতে বরাবর রাজ-বাড়ীতে আসিল। ইরাণী তখন মেমসাহেবের সহিত টেনিস্ খেলিতেছিল। মোহনলালকে সেই সময়ে আসিতে দেখিয়া ইরাণী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল—

"লালাজী, খেলবেন্?"

মোহনলাল বলিল,

"আমি খেলা ভুলে গেছি।"

ইরাণী অভিমানের স্বরে মেমকে শুনাইয়া বলিল :—

"খেলা ভুলে যান নি—বোধ হয় বিলাতী খেলা বলে' আপত্তি"—

মেম হাসিয়া মোহনলালকে জিজ্ঞাসা করিল :—

"তাই নাকি লালাসাহেব ? বিলাতী খেলার সঙ্গেও নন্-কো অপারেশান ?"—

মোহনলাল অপ্রতিভ হইল। অস্তগামী সূর্য্যের লালিম কিরণজাল ইরাণীর শ্রম-রক্তিম মুখে পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। কিন্তু আজ মোহনলাল তাহার মনকে এমন করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দিবে না বলিয়া স্থির করিল। সে আজ কাজের কথা কইতে আসিয়াছে। আজ এমন বিমনস্ক হইলে কি চলে ?

সে তাহার চাদরটি ভূমিতে রাখিয়া একখানি র‍্যাকেট লইল দেখিয়া, মেমসাহেব 'লন' হইতে বাহিরে আসিলেন। ইরাণীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। অনেক দিন মোহনলাল না খেলিলেও, সে যে এক সময়ে বেশ ভাল খেলিত, তাহা ইরাণী অল্পক্ষণেই বুঝিয়া লইল।

খেলা সাজ হইবার পূর্ব্বেই দুইটি অশ্ব সজ্জিত হইয়া আসিল। ইরাণী বেড়াইতে যাইবার জন্ত লালাজীকে ধরিল। মোহনলাল মেমসাহেবের দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন :—

"হাঁ লালাসাহেব, আপনি আজ ইরার সঙ্গে বেড়াতে গেলে আমি সুখী হ'ব। আমার সহরে একটু কাজ আছে, সেটা আমি তা'হলে সারতে পারি।"

মেমসাহেব আর উত্তরের জন্ত অপেক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া গেলেন। সহিস একটি ঘোড়ার সাজ বদলাইয়া আনিল। খেলা শেষ হইলে মোহনলাল ও ইরাণী দুই অশ্বে চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইল।

খসরুবাগের পাশ দিয়া যে রাস্তা বরাবর কেল্লার দিকে গিয়াছে সেই রাস্তায় দুইজনে পাশাপাশি হইয়া চলিল। কিছুদূর মৌনভাবে গিয়া, ইরাণী জিজ্ঞাসা করিল :—

"রেবা, আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসে না কেন, লালাজী ?"

মোহনলাল উত্তর করিল :—

"কেন আসে না, তা জানিনে। বোধ হয় বড় হয়েছে বলে' মা বেশী বেরুতে দেন না তাকে।"

"এমন কি বড় হয়েছে রেবা ! আমারই ত বয়েস প্রায়, না ?"

মোহনলাল একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল :—

"হবে, বোধ হয়। সে আমার আট ন'বছরের ছোট।"

"রেবা বড় ভাল মেয়ে। যেমন দেখতে, তেমনই স্বভাব। আপনার যোগ্য বোন্, লালাজী।"

ইরাণীর এই সুখ্যাতি পরোক্ষভাবে মোহনলালকে কিছু বিব্রত করিয়া তুলিল। তাহার মুখ যে লাল হইয়া উঠিল, তাহা ইরাণী লক্ষ্য করিয়া হাসিল।

"মোহনলাল বলিল :—"রেবার বে' বে' করে মা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন"—

ইরাণী অন্তমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিল :—"তা বে'র বয়েস ত হয়েছে, মা ভাববেনই ত।"

"হাঁ, তোমাদের দু'জনের বে' হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

"ওঃ আমার জন্যেও বুঝি আপনার ভাবনা পড়েছে?" ইহার ভিতরে যে একটু শ্লেষ ছিল, তাহা মোহনলালের বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

"কেন, তোমার জন্যে ভাব্‌তে কিছু দোষ আছে? তোমারও ত বে'র বয়েস হয়েছে।"

ইরাণী চুপ করিয়া রহিল। মোহনলাল বলিল :—

"ভেবে দেখ ইরা, রেবা ও তুমি আমার কাছে দুই-ই সমান। আমাকে দু'জনের জন্যেই ভাবতে হবে।"

ইরাণী কিছুই বলিল না। মোহনলাল সাহস পাইয়া বলিল :—

"তোমার জন্য উপযুক্ত পাত্রই পেয়েছি। রেবার জন্যে ঐ রকম একটি ভাল বর পেলে বাঁচি।"

ইরাণী এবারে হাসিয়া ফেলিল।

"আমার জন্যে কোথায় পাত্র যোটালেন, শুনি?"

মোহনলালের মনে হইল, এতখানি বেহায়াপণা করা ইরার উচিত নহে। সে গম্ভীর-ভাবে বলিল :—

"কর্মৌলির কুমারের সঙ্গে কথা চল্‌ছে"—

"ওঃ আপনি রীতিমত ঘটকালী জুড়ে দিয়েছেন দেখ্‌ছি।" মোহনলাল চুপ করিয়া রহিল। সে এরূপ পরিহাসের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইরাণী বলিল :—

"কুমার বাহাদুর বোধ হয় হীরের আংটি দিয়ে ঘটক বিদায় করবেন।"

"হীরের আংটি, কেন?"

"সেদিন দেখলাম যে তার দশ আঙুলে বোধ হয় কুড়িটা হীরের আংটি হবে, অত আংটি যার হাতে, তার দু'চারটে দিতে বোধ হয় আটকাবে না"—

মোহনলাল বলিল :—"হাঁ, কুমারের আংটির সখ খুব—তুমি বল্‌তে মনে পড়ল, সেদিন তোমাদের বাড়ীতে দেখেছিলাম বটে। কিন্তু লোকটি খুব ভাল, স্বভাব চরিত্র রীতি সুন্দর, বয়েসও বেশী নয়; বোধ হয় চল্লিশ পঁচিশ হবে।"—

মোহনলাল আরও বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু ইরাণী হঠাৎ গম্ভীরভাবে বলিল :—

"লালাজী আপনি বৃথা কষ্ট করবেন না। আমার এ বিবাহে মত নেই।"

এই বলিয়া সে ঘোড়া ফিরাইয়া দিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। দু'জনে ঘোড়া ছুটাইয়া গৃহে ফিরিল, কিন্তু আর একটিও কথা হইল না।

৯

কুমার জওলাপ্রসাদকে জবাব দিবার জন্য মোহনলালকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, কারণ ইরাণী সেই সান্ধ্যভ্রমণের দুই একদিন পরেই এত অসুস্থ হইয়া পড়িল, যে আপাততঃ

বিবাহের প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। কুমারের আগ্রহ যে তাহাতে কিছুমাত্র ন্যূনতাপ্রাপ্ত হইল, এরূপ বুঝা গেল না। কারণ তিনি মোহনলালের বাড়ীতে নিত্যই আসিতে লাগিলেন।

ইরাণী ডাক্তারের পরামর্শে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্ত শিমলায় রওনা হইল। সঙ্গে পিসিমা ও মেমসাহেব গেলেন। ম্যালের নিম্নে একটি ত্রিতল বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। মোহনলাল গেলে বৈষয়িক কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে, কাজেই পুরাতন একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে লইয়া ইরাণী শিমলায় আসিল।

শিমলায় আসিয়া কিছুদিনের মধ্যে তাহার অসুখ ভাল হইল বটে, কিন্তু তাহার মনের প্রফুল্লতা কিছুতেই ফিরিয়া আসিল না। পিসিমা ও মেমসাহেবের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইরাণী অনেক সময়ে গম্ভীর হইয়া থাকে—যেন কতই ভাবনা তাহার মনে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কোনও প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় এবং নিজের বোকামির জন্ত নিজেই শেষে হাসিয়া ফেলে। সে হাসিও ম্লান। কৌচের উপর হয় ত একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিল, বই কোলের উপর খোলা পড়িয়া রহিল, সে হয় ত জানালা দিয়া সুদূর আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত! সে দেখিত শরতের উজ্জ্বল নীল আকাশ,—পাহাড়ের পর পাহাড়ের স্তর ঢেউ খেলিয়া সুদূর দিকচক্রবালে গিয়া মিশিয়াছে; পাইন গাছের সারি ধাপে ধাপে উঠিয়া, নামিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতমালাকে হরিতবর্ণের আবরণে ঢাকিয়া দিয়াছে। ইরাণী অ-শ্রান্ত-নয়নে এই বর্ণের লীলাবৈচিত্র দেখিয়া সময় কাটাইত।

শরতের সোণালি অপরাহ্ন যখন সন্ধ্যার নীলিমায় মিশিত, তখন পিসিমার নিতান্ত পীড়া-পীড়িতে কোনও কোনও দিন ইরাণী বেড়াইতে বাহির হইত। সে ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসে, তাহার জন্ত নিত্যই অশ্ব সজ্জিত থাকিত। সে মোটর চালাইতে ভালবাসে, এইজন্ত এলাহাবাদ হইতে দুখানি মোটর আনাইয়া লওয়া হইল। কার্টরোডে নামিয়া কোনও কোনও দিন সে মোটরেও বেড়াইতে যাইত। কিন্তু কিছুদূর গিয়া কোনও না কোনও ছল করিয়া সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিত। কিছুই যেন তাহার ভাল লাগে না। পিসিমা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে শরৎ হেমন্তে পরিণত হইল। রৌদ্রের প্রখরতা কমিয়া আসিল। যেদিন মেঘ করিত বা এক পশলা বৃষ্টি হইত, সেদিন শীতের হাওয়া বহিত। ইরাণীর জন্মদিন নিকট হইয়া আসিল। পিসিমা মোহনলালকে লিখিলেন, এবারে ঘটা করিয়া ইরাণীকে জন্মদিনের উপহার দিতে হইবে। মোহনলাল কখনও এই জন্মদিনের খবর রাখিত না। কিন্তু এবারে পিসিমা যখন লিখিয়াছেন, তখন তাহাকেও কিছু দিতে হয়, না দিলে ভাল দেখায় না।

মোহনলাল জানিতে চাহিল, ইরাণী কি পাইলে খুসী হয়। ইরাণী কিছুই স্থির করিতে পারিল না; সে শুধু জানাইল যে লালাজী যাহা নিজহস্তে দিবেন, তাহাই সে সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিবে। ডাকের মারফতে সে কিছুই লইতে চাহে না। পিসিমাও এই চিঠির সঙ্গে তাহাকে জন্মদিনের উৎসবে আসিবার জন্ত রীতিমত নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন।

মোহনলালের পক্ষে এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইল না। সে ইরাণীকে লিখিল, "এই জন্মদিনে তুমি উনিশ বছরে পড়িবে। তোমার পিতার সম্পত্তি যাহা এতদিন আমার নিকট গচ্ছিত ছিল, এবং যাহা আমি আমার সাধ্যমত বাড়াইয়াছি, তাহাই তোমাকে আমি এই জন্মদিনে উপহার দিব। রাজাবাহাদুরের যে নগদ টাকা ছিল, তাহার খবর তুমি বোধ হয় কখনও জানিবার চেষ্টা কর নাই ; আমি এই কয়েক বৎসরে সে টাকা প্রায় দ্বিগুণ বাড়াইয়াছি, তাহাই তোমাকে তোমার জন্মদিনে উপহার দিয়া বিদায় লইব। আমার কাজ শেষ হইয়াছে, এখন তুমি উপযুক্ত হইয়াছ, তোমার বিষয়সম্পত্তির ভার তুমিই গ্রহণ কর। আমি শিমলায় গিয়া তোমার জন্মদিনে সমস্ত তোমাকে বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিব। রেবাকে আমি যেরূপ স্নেহের চোখে দেখি, তোমাকেও সেইরূপ। আমার প্রতি তোমাদের উভয়েরই দাবী সমানভাবে থাকিবে।"

ইরাণী অনেকবার এই চিঠি পড়িল ; পিসিমাকে পড়িয়া শুনাইল। মোহনলাল বিদায় লইবে, এ কথা স্মরণ করিয়া পিসিমার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। চিঠি পড়িবার সময় ইরাণীর কণ্ঠও বাষ্পে ভরিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার জন্মদিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার অবসাদ দূরে গেল। সে আবার আগের মতই হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে ঘরে মোহনলালকে থাকিতে দিবে, তাহা সে নিজে থাকিয়া সাজাইল। জন্মদিনে কিরূপ খাওয়া দাওয়া ও উৎসবের বন্দোবস্ত হইবে, তাহা সে নিজে স্থির করিয়া দিল। অসুখের যে ম্লান ছবি তাহার সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা অল্পদিনের মধ্যেই অপসারিত হইল।

মোহনলাল আসিল। ইরাণীর শরীর শেষের কয়েকদিনের মধ্যে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে দেখিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিল। কার্ত্তিকমাস শিমলায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর সময় ; স্বাস্থ্যও এই সময়ে ভাল হয়। কাজেই আর কিছুদিন থাকিলে যে ইরাণী একেবারে নিরাময় হইয়া যাইবে, এ সম্বন্ধে মোহনলাল বিশেষ ভরসা করিয়া বলিল।

জন্মদিন আসিল। স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করিয়া, চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া, ইরাণী দেবতার অর্চ্চনা করিল। পরে সকলকে যথাযোগ্য উপঢৌকন দিয়া প্রণাম ও সম্ভাষণ করিল। তাঁহারাও উপহার যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ ও শুভকামনা জানাইলেন। মোহনলালকে প্রণাম করিতে গিয়া ইরাণী চোখের জল ফেলিল ; মোহনলালও চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কম্পিতহস্তে একটি স্বর্ণ-খচিত চন্দনকাষ্ঠের বাক্স সে ইরাণীর হাতে দিল এবং তাহার চাবিটি দিয়া বলিল, "এর মধ্যে তোমার সিন্দুকের চাবি ও একটি হিসাবের বই আছে, দেখে নেও। আজ আমার ছুটী।"

মোহনলাল উঠিয়া দ্রুতপদে বাহিরে গেল। ইরাণী স্তব্ধ হইয়া সেই বাক্স হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন আহারাদি শেষ হইতে হইতে অপরাহ্ন হইয়া গেল। তারপর পাহাড়ী নাচ ও ম্যাজিক হইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আকাশের নীলিমায় একটু একটু করিয়া রঙ ফলাইতেছিলেন। বিকালে এক পশলা বর্ষা হইয়া যাওয়াতে আকাশ একেবারে মেঘনির্মুক্ত হইয়াছে। বাতাসে যদিও শীতের একটু আমেজ দিয়াছিল, তথাপি সান্ধ্যভ্রমণের পক্ষে সে সন্ধ্যা অতি প্রলোভনজনকরূপে দেখা দিল। ম্যালের রাস্তা দিয়া দলে দলে সাহেব মেম, পাঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষ বাহির হইয়া পড়িল। ইরাণীও বাহির হইবে বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিল; মোহনলালকেও অনুরোধ করিল।

উভয়ে মোটা কাপড় গায়ে দিয়া কার্টরোডে নামিয়া আসিল; সেখানে মোটর লইয়া সোফেয়ার অপেক্ষা করিতেছিল। ইরাণী বলিল সে নিজেই গাড়ী হাঁকাইবে। সুতরাং সোফেয়ার তাহার সহিসকে ডাকিয়া দিল; সে গাড়ীর পশ্চাতে বসিল। ইরাণী চাকা লইয়া বসিল। মোহনলাল সামান্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া ইরাণীর পার্শ্বে উপবেশন করিল।

শিমলা হইতে কালকা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা পর্ব্বত ঘুরিয়া নামিয়া গিয়াছে, তাহারই নাম কার্টরোড। মোটরের রাস্তা শিমলায় মাত্র এই একটি; সুতরাং তাহারা এই রাস্তা ধরিয়া নামিতে লাগিল। এই রাস্তায় মোটর চলে বটে, কিন্তু চালককে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ প্রত্যেক দশকুড়ি গজ অন্তর পার্ব্বতীয় রাস্তা ঘুরিয়া গিয়াছে। প্রতিমুহূর্ত্তেই চাপা দিবার আশঙ্কা। কাজেই ইরাণী একমনে, বাঁশী বাজাইয়া, চাকা ঘুরাইয়া গাড়ী চালাইতেই ব্যস্ত হইল। কথা কহিবার অবকাশ পাইল না। একবার মাত্র মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিল :—

"বড় গাড়ীখানা কি হলো?"

ইরাণী উত্তর করিল—

"সেখানা ঠিক আছে, এ রাস্তায় ছোট গাড়ীই ভাল; দেখছেন না জায়গায় জায়গায় রাস্তা কত সরু?"

তারপর একটু থামিয়া বলিল :—

"আপনার কি বসতে অসুবিধে হচ্চে!"

"কিছু না" বলিয়া মোহনলাল ভাল হইয়া বসিল। ইরাণীর অঙ্গস্পর্শে তাহার যে কোনও আপত্তি ছিল, তাহা নহে; তথাপি আজ তাহার মনে হইল যেন আরও একটু ব্যবধান মাঝখানে থাকিলে ভাল হইত।

বহুক্ষণ ধরিয়া মোটর চলিল। বিকালে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; মাটী ভিজিয়া নরম হইয়া রহিয়াছে; তাহার উপর দিয়া রবারের চাকা অনায়াসে হাল্কা গতিতে চলিতে লাগিল। রাস্তা ক্রমেই নামিয়া গিয়াছে, সুতরাং বড়ই আরামে আজ গাড়ী চলিতেছিল।

সহিস একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিল। এত রাত্রি হইয়া গেল, তবুও মনিবদের ফিরিবার নাম নাই; এমন ত কখনও হয় না। পেট্রল বেশী করিয়া আনিলে হইত।

বাস্তবিকই পেট্রল ফুরাইয়া আসিয়াছিল এবং শোনীর নিকটে গিয়া গাড়ী একেবারেই থামিয়া গেল।

দু'ধারে পাহাড়, মাঝখানে সরু রাস্তা—চাঁদের আলোয় রজত রেখার মত দেখাইতেছে, এমনই অবস্থায় একস্থানে গাড়ী সহসা থামিয়া গেল। সহিস নামিয়া পড়িয়া বনেট্ খুলিয়া দেখিল ভ্যাকুয়মে পেট্রল নাই। সে ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল; মনে করিল আজই তাহার চাকরী যাইবে। কিন্তু ইরাণীর ব্যবহারে আশঙ্কার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে মোহনলালের প্রশ্নের উত্তরে অতি সহজভাবে বলিল :—

"পেট্রোল ফুরিয়েছে?"

"এখন উপায়?"

ইরাণী আকাশে হাত তুলিয়া বুঝাইল যে, উপায় ভগবান। মোহনলাল চিন্তিত হইল। হঠাৎ ইরাণীর মনে পড়িল, শোনীতে সৈন্যদের একটি ছাউনি আছে, সেখানে হয় ত পেট্রল পাওয়া যাইতে পারে। সহিসকে পেট্রোল আনিতে পাঠাইয়া উভয়ে পায়চারী করিতে লাগিল।

কার্টরোড হইতে স্বল্পবিপ্রশস্ত রাস্তা একটি পাহাড়ের উপরিভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে; ইরাণী সেই রাস্তা ধরিয়া চলিল। মোহনলালও চলিল। উভয়ে নীরব। রাত্রি তখন প্রায় ৯টা। যদি পেট্রল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে, এই চিন্তায় মোহনলাল উদ্বিগ্ন হইতেছিল। ইরাণী তাহাকে সাহস দিয়া বলিল, সে চিন্তায় কোনও ফল নাই। যাহা হইবার তাহা হইবেই। সে তাহার অভ্যস্ত চঞ্চলগতিতে পর্ব্বতের উপর উঠিল। মোহনলাল তাহার সহিত গতিরক্ষা করিতে গিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল। পাহাড়ের উপরে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে একখানি প্রস্তর পড়িয়া ছিল। উভয়ে সেই পাথরের উপরে গিয়া বসিল।

নিস্তব্ধ রজনী, জনমানবের সাড়াশব্দ কোথাও নাই। নিম্নে পাইনবৃক্ষের সারি স্তরে স্তরে নামিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ঝিঁঝিঁর ডাকে নিস্তব্ধতা যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। দূরে নির্ঝরিণীর কলতান বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। আজ বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় সমস্ত ঝরণাগুলি যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। নিম্নের উপত্যকা হইতে তাহাদের মৃদুগম্ভীর সঙ্গীতে মুমেঘু রাগিণী বাজিতেছে। জোছনা আজ নীল আকাশে মাতাল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে—দূরে পাহাড়ের গায়ে চন্দ্রকিরণের কুয়াসা জমিয়া উঠিতেছে।

ইরাণী বলিল :—"কি সুন্দর রাত!"—

মোহনলাল বলিল :—"কি সুন্দর স্থান।"—

ইরাণী বলিল :—"আজ আমার জন্মদিন।"

মোহনলাল বলিল :—"আজ আমার ছুটি"—

ইরাণী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল :—"আজ আমি স্বাধীন"—

মোহনলাল ইরাণীর দুইহাত নিজের হাতে লইয়া বলিল :—"আজ তুমি স্বাধীন; ইরা, আজ

আমার বিদায়নিশি"—ইরাণী হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল না। চুপ করিয়া রহিল। তাহার সমস্ত শরীর উদ্বেলিত করিয়া কান্না আসিতেছিল। মোহনলালও চোখের জল মুছিল।

ইরাণী একখানি হাত ছাড়াইয়া লইয়া, পকেট হইতে সেই চন্দনকাঠের বাক্সের চাবি বাহির করিয়া মোহনলালের হস্তে দিল। বলিল :—

"এ চাবি আমি নিয়া কি করবো? তোমার চাবি তুমি লও। আমি শুধু তোমার দাসী হয়ে থাকবো"—

ইরাণী আগে কখনও মোহনলালকে 'তুমি' বলিয়া সম্ভাষণ করে নাই। মোহনলাল আবেগ-ভরে ইরাণীকে বক্ষে টানিয়া লইল ও তাহার কম্পিত অধরপুটে ও ললাটে গাঢ় চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

নিম্নে মোটরের বাঁশী শুনিয়া তাহারা বুঝিল সহিস ফিরিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এ তাহাদের গাড়ীর বাঁশী নহে।

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া পিসিমা বড় গাড়ীখানা লইয়া সোফেয়ারকে অগ্রসর হইতে বলিয়া গিয়াছিলেন। সোফেয়ার জানিত ছোট গাড়ীতে পেট্রল খুব কমই আছে। সুতরাং সে একটিন পেট্রলও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। সেই পেট্রল ঢালিয়া ছোট গাড়ীতে ইরাণী ও মোহনলাল বসিল। সহিস আসিলে সে ও সোফেয়ার বড় গাড়ীতে ফিরিল।

এবারে মোহনলাল ইরাণীর কাছে ঘেঁসিয়া বসিতে আপত্তি করিল না!

* * * * * * *

কিছুদিন পরে তাহারা যখন এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিল, তখন মোহনলাল কিছু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার চিন্তা জওলাপ্রসাদকে বলিবে কি? সে নিশ্চয়ই মনে করিবে যে মোহনলাল প্রথম হইতে চক্রান্ত করিয়া এই বিবাহ হইতে দিল না। কিন্তু তাহাকে বেশীক্ষণ চিন্তায় ক্লেশ দিতে পারিল না। কারণ তাহার মাতা প্রথমেই তাহাকে সংবাদ দিলেন যে রেবার সহিত কুমারবাহাদুরের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। রেবাও লজ্জানম্র বদনে তাহার সমর্থন করিল।



আনন্দ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ফাগুনের অপরাহ্ন। সঙ্গীহীন। মুক্তবাতায়নে
বসে' আছি আঁখি মেলি' সম্মুখের কুটীর প্রাঙ্গণে
নিম্ব গাছটির দিকে। দক্ষিণের স্বমন্দ বাতাসে
কচি কিশলয়গুলি দুলিতেছে পরম উল্লাসে
হিন্দোল-দোদুল ছন্দে। ভিন্নরীতি দুটি সঙ্গী মাঝে
প্রকৃতির বক্ষ ভরি' অপরূপ মৌন বীণা বাজে!

*　　*　　*　　*

সহসা পড়িল নেত্র তারি মাঝে বৃক্ষতল দেশে—
প্রতিবেশী জেলেদের দুরন্ত ছেলেটি নগ্নবেশে
তারি মত হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণ এক ছাগশিশু সাথে
খেলিতেছে মহানন্দে গ্রীবাটি বেড়িয়া দুটি হাতে;
কি আগ্রহে কি আনন্দে দেয় চুমা এ উহার মুখে,
সেও ফিরাইয়া দেয় সে সোহাগে অপূর্ব্ব কৌতুকে!
জননী নিকটে নাই, কাজে ব্যস্ত বুঝি গৃহকোণে,
দ্বিধাহীন শিশুদুটি খেলে তাই আপনার মনে।

*　　*　　*　　*

অন্ধকার নেমে আসে। একা বসে' ভাবিতেছি তাই—
সত্যই কি শিশুদের আনন্দের কোন বাধা নাই!
মানুষের অহঙ্কার সত্যই কি সীমারেখা টানি'
পরস্পরে দূরে রাখে রচি' তার ভেদগণ্ডীখানি।

দোটানা

শিল্পী—শ্রীভুষনমোহন মুখোপাধ্যায়



কর্তা চিঁড়ের বাইশ ফেরে পড়েছেন—অন্ধকার যুগের কুসংস্কার তাঁকে পেছনে টানছে, আবার সভ্য মোহের টানে পা বাড়িয়ে ঝড়ঝাপটার ঠেলায় অস্থির হয়ে পড়ছেন।

সত্য রক্ষা

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"আজ যে খুব সকাল সকাল ফিরে এলে ?"

"তোমার দেবতা 'সিদ্ধি' খেয়েছেন মিনতি,—বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ হাসিতে লাগিলেন।"

"আজ যে দেখ্‌ছি খুব খুসী ? একটা বক্‌সিস্‌ টক্‌সিস্‌ হবে না ? আমার দেবতা না হয় সিদ্ধি খেয়েছেন—তরা অবশ্য ডোবাবেন না। মহাশয়ের দেবতা কি চপ্‌, কাট্‌লেট্‌ খেয়ে মাটিতে জুতো ঠুক্‌ছেন। বলি, মহাশয় হেঁয়ালি ছাড়িয়া শাদা কথা বল্‌লে বোধ হয় বলার অগৌরব হ'বে না ? সংবাদটা কি শুন্‌তে পাই না ?"

"মিনতি—এটা তোমার একটানা দোষ যে, তুমি আমাকে কেবল হেঁয়ালি বল্‌তেই শোন। কথার ভেতর যদি একটু ভাব না রইল তবে সে কথায় পান্‌সে দুধের মত—কোন স্বাদ থাকে না।"

"চলুক। যত পার চালাও ; আমিও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে প্রস্তুত নই—দেখা যাক্‌ তর্ক শেষটা কোথায় গিয়ে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরে।"

কলিকাতার বৌ-বাজার অঞ্চলের একটি ত্রিতল অট্টালিকায় একখানি সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে বসিয়া স্বামীস্ত্রীর পূর্ব্বোক্ত রসালাপ চলিতেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতার ভিতর একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার বেশ সুনাম ও খ্যাতি আছে। তিনি সুরসিক। তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত সুখের। স্বামীস্ত্রীতে খুব প্রণয়। এক বৎসর হইল পুত্র সতীশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে নিজ রাজ্য বিস্তার করিয়া প্রবল পরাক্রমে স্নেহ-সিংহাসন খানির অপ্রতিদ্বন্দ্বী একছত্র সম্রাট হইয়া বসিয়াছে।

সেদিন, সংবাদপত্রের স্তম্ভে মিনতি দেখিলেন, বড় বড় হরফে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে—

"গঙ্গা-সাগর যাইবার বিশেষ সুবিধা, মহিলাদের জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।"

বিজ্ঞাপন পড়িয়া তাঁহার কেবল মনে হইতেছিল পুরী অনেকবার গিয়াছি, সে কিন্তু, রেলে চড়িয়া। জাহাজে করিয়া যাইতে কিন্তু খুব আনন্দ হয়।

গঙ্গা-সাগরে যাইলে জাহাজে করিয়া যাইতে হইবে। যাইলে হয় না ? মনে মনে স্থির করিল, তিনি আসিলে, তাঁহাকে এ বিষয় মত করাইতে হইবে। সে আজ পনরদিন

পূর্ব্বের কথা। আজ কয়েকদিন ধরিয়া সত্যেন্দ্রের সহিত মিনতির এই বিষয় লইয়া ভীষণ আলোচনা ও তর্ক চলিতেছে। সত্যেন্দ্র ভীড়ের মধ্যে তীর্থ করিতে যাওয়ার বড় একটা পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নানারূপ অসুবিধা দেখাইয়া প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিতে চাইতেছিলেন। মিনতি কিন্তু, সহজে বশ্যতা স্বীকার করিবার মত মেয়ে নয়। তিনি জেদ ধরিয়া বসিলেন, বলিলেন, "পৃথিবীশুদ্ধ লোক যাইতে পারে, আর আমি যাইলে যত দোষ। সে হবে না—আমি যাবোই, একটা ব্যবস্থা কর।"

"যাহা হৌক করা যাইবে।" বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ যুদ্ধ অপেক্ষা সন্ধিটাই উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় ঠিক করিয়াছিলেন। সেজন্য আজ কয়েকদিন যুদ্ধ স্থগিত আছে। সন্ধিপত্র এখনও স্বাক্ষর হয় নাই, লড়াইয়ের যথেষ্ট আশঙ্কা এখন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই আজ সত্যেন্দ্রনাথ যখন বাহির হইতে আসিয়া বলিলেন, "তোমার দেবতা সিন্নি খেয়েছেন" তখন মিনতির মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তবে কথাটা পরিষ্কার করিয়া স্বামীর মুখ হইতে শুনিতে চান। তাই হেঁয়ালির উল্লেখ করিয়া স্বামীকে বিদ্রূপ করিলেন।

সত্যেন্দ্রবাবু বলিলেন, "সত্য মিনতি, তুমি ঠিক ধরেছ, আমার ঠাকুর চপ কাটলেট্ খেয়ে মাটিতে বুট ঠুকিয়া আজ কি বলেছেন শোন!

সাহেবপুঙ্গব বলিলেন "তুমি ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তার। আজও তোমার মন হ'তে কুসংস্কার দূর হলো না? তুমি ভীড়ের ভয়ে, ব্যারামের ভয়ে, একটু খানি কষ্ট ভোগ করিবার সম্ভাবনায় কিনা গঙ্গা-সাগরগামী লোকেদের জীবনরক্ষা করার জন্য যেতে চাও না? তোমার দেশের লোকের জন্য, আমরা বিদেশী হয়েও এত বন্দোবস্ত করছি, আর তুমি তা'দের স্বদেশবাসী হয়ে যেতে চাচ্ছ না! ছো!"

"তুমি ত জান মিনতি, আমি তা'দের অপিসের মাহিনা-করা ডাক্তার। জোর করে যাব না বল্‌তে সাহস হ'ল না। দাসত্বের এমনি মহিমা!

আমাকে নীরব দেখিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর সময় নেই, আজ আমাকে সব ব্যবস্থা করতে হবে—যেতে পারবে কিনা বল?"

সাহেবের রক্ত-চক্ষুর সম্মুখে "না" বলা গেল না, তাই বাধ্য হ'য়ে "হাঁ!" বলে এসেছি। তোমার দেবতা সিন্নি খেয়েছেন, বুঝলে?"

২

আজ ভোর রাত্রিতে গঙ্গাসাগরে জাহাজ ছাড়িবে। মিনতি সমস্ত জিনিষপত্র বাঁধিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। সত্যেন্দ্রবাবু, ছোটছেলে লইয়া মিনতি যাওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু মিনতির নিকট কোন যুক্তি সেবার টিকিল না। তিনি বলিলেন, গঙ্গা-সাগর আমাকে টানিয়াছেন, আমার মনে হইতেছে, গঙ্গা-সাগর না যাইলে আমার অমঙ্গল হইবে। আমি যাইবই।

অগত্যা মিনতির যাওয়া স্থির হইল। সত্যেন্দ্র আর আপত্তি করিলেন না।

সত্যেন্দ্র সাহেবকে বলিয়া একটি স্বতন্ত্র কেবিন বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। মিনতি মহানন্দে সতীশচন্দ্রকে কোলে করিয়া নির্দিষ্ট কেবিনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যথাসময় জাহাজ ছাড়িল।

গঙ্গার দুকূলের শোভা দেখিতে দেখিতে, মিনতির মন একটা বিপুল পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। কেমন ধীরে ধীরে, গঙ্গা গেঁওখালীর পর চওড়া হইয়া পড়িল। নিকট হইতে অল্পে অল্পে, তীর যেন সরিয়া যাইতেছিল। নদীতট-উপরিস্থিত বড় বড় বৃক্ষরাজি ক্রমে ক্রমে ছোট, পরে অদৃশ্য হইয়া আসিতেছিল, ক্রমে মিনতি দেখিলেন, আকাশে জলে এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এর পর বুঝি আর কিছু নাই! কোন অনন্তে তারা যেন আজ ভাসিয়া চলিয়াছেন। সীমা নাই! কূল নাই! শেষ নাই! মিনতি সতীশচন্দ্রকে কোলে করিয়া কেবিনের জানালার নিকট গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সতীশকে বলিলেন, "সতীশ, কোথায় যাচ্ছি বল দেখি?"

সতীশচন্দ্র কি বুঝিল, তাহা অবশ্য সে ভিন্ন কাহারও পক্ষে জানা অসাধ্য। তার কান ছিল ইঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ শব্দের উপর—আর তরঙ্গের ভীষণ গর্জ্জনের উপর। সে জননীর কথায় বা আপন খেয়ালে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল অনন্ত নীল আকাশের দিকে।

এই সময়, সত্যেন্দ্র মিনতির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, খোকাকে কি দেখাচ্ছ মিনতি?

মিনতি উত্তর করিলেন "আমরা কোথায় যাচ্ছি, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "মাতব্বর, সমজদার ব্যক্তিকেই প্রশ্ন করা হ'য়েছে? তিনি কি জবাব দিলেন?"

"তা, তুমি সতীশচন্দ্রকেই কেন জিজ্ঞাসা করনা?" বলিয়া মিনতি সতীশকে সোহাগভরে স্বামীর কোলে দিলেন। সত্যেন্দ্র সতীশের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "কিহে বিজ্ঞ সমালোচক, বল্‌তে পার আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

সতীশ তখন এক ঝাঁক পাখী জলের উপর উড়িতে দেখিয়া সেদিকে সে চাহিয়াছিল, সুতরাং হাসিয়া সেইদিকেই দেখাইয়া দিল।

সত্যেন্দ্র ও মিনতি দুইজনেই হাসিয়া উঠিলেন। সত্যেন্দ্র বলিলেন, "মিনু, এবার জাহাজ সাগরে পড়বে? তুমি সাগর দেখ্‌তে ভালবাসো দেখ্‌ব কেমন সাহস ঢেউ দেখে কাঁপিয়ে উঠ কি না?"

সাগর দেখিবার জন্য মিনতির আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল। গঙ্গাসাগর সম্বন্ধে কত কথাই আজ তাহার মনে পড়িতেছিল। শুনিয়াছিল, একবার একখানি জাহাজ ঝড়ে যাত্রীসহ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল—একটী প্রাণীও রক্ষা পায় নাই! এমন কত নৌকাও সাগরে ডুবিয়াছে। একথা

ভাবিতে সহসা ভয়ে তাঁর প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল! তিনি মনে মনে, দেবতাকে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিলেন। খানিকপরেই জাহাজ সাগরে পড়িল। সাগরে পড়িতেই, অত বড় জাহাজ নাচিয়া উঠিল। যাত্রীরা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল। বাতাসের স্কন্ধে চাপিয়া সে ধ্বনি বুঝি বা কপিলমণির পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে ছুটিল।

সাগরে স্নান করিয়া আসিয়া মিনতি দেখিলেন, সতীশ কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তার মুখে হাসি নাই—সে হাত পা ছোড়া নাই। তিনি তাড়াতাড়ি সতীশকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুধ খায় নাই, তারপর জাহাজের দোল লাগিয়া বোধ হয় সে এমন হইয়া পড়িয়াছে। সতীশের মুখে এক ঝিনুক দুধ দিবার মাত্র সে বমি করিয়া তুলিয়া ফেলিল। দুই মিনিটের পরে পুনরায় বমি করিতেই মিনতি বড় ভয় পাইল। একজন খালাসীকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "শিগ্‌গির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন। বলিস্ খোকাবাবুর বড় অসুখ এখনি আসুন।"

অদূরে একখানি ফ্লাটের উপর ডাক্তারবাবু তখন রোগী দেখিতেছিলেন। পুত্রের অসুখের কথা শুনিবামাত্র তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখ দিয়া প্রথমটা কোন কথা নিঃসরণ হইল না।

"মিনতি, সতীশের যে কলেরা হইয়াছে?"

"বল কি? কি হবে?"

"ভগবানকে ডাক। ঔষধের বাক্সটা এখানে নিয়ে এসো।

সত্যেন্দ্র সাধ্যমত ঔষধ দিল। কিন্তু, রোগ বাড়িয়া চলিল। কোন প্রতিকার হইল না। ইন্‌জেক্‌সন্ দিবার জন্য একটা ঔষধ তিনি বাক্সের মধ্যে অনেক খুঁজিলেন, কিন্তু ঠিক সেই ঔষধটা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। এরূপ ভুল ত তাঁ'র কোনদিন হয় নাই। তখন সত্যেন্দ্র একরূপ নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিলেন। নিজ পুত্রের ব্যাধির কথা বলিয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য একখানি 'লঞ্চ' চাহিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "দেখছেন ত, কি গুরুতর দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে। উপায় থাকলে আপনার ছেলের জন্য লঞ্চ ছেড়ে দিতে পারতাম। আমাকে ডাক্তারবাবু ক্ষমা করবেন, আমি হৃদয়হীন নই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার ছেলে সেরে উঠুক। এখন আপনি কি করবেন মনে করছেন?"

"একখানা নৌকা করে বেরিয়ে যাব। ডায়মণ্ডহারবার থেকে রেল ধরে যদি ততক্ষণ—

আর তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।"

দাঁড়িদের ডাকিয়া তিনি বলিলেন, তোমরা যদি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাকে ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে দিতে পার, একশো টাকা বক্‌শিস্ দিব। সত্যেন্দ্র মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সেখানে একবার কোন প্রকারে যাইতে পারিলে, হাঁসপাতাল হইতে নিশ্চয় ঔষধ পাইব।

দাঁড়িরা বলিল,—বাবু, আমাদের টাকার লোভ দেখাবেন না। আমরা ছোট লোক, দাঁড়ি হ'লেও মনে রাখবেন আমাদেরও ছেলে-মেয়ে আছে। আপনার ও মাঠাকুরণের যে কি হ'চ্ছে, তা, বুঝতে পাচ্ছি। আমাদের প্রাণ দিয়ে নৌকা নিয়ে যাব, কিন্তু দেবতা রাজি হ'লেই হয়।"

দাঁড়িরা প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টানিতে লাগিল। এই দম্পতীর মর্ম্মবেদনা তাঁহাদের অন্তর ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছিল। মিনতি যখন ব্যাকুল কাতরদৃষ্টিতে মাঝির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "আর কতদূর বাকী আছে বাবা?" সেকথাগুলি যেন মাঝির অন্তঃস্থলে গিয়া বিঁধিল।

সতীশ এবার যেন অসাড় হইয়া পড়িল। সর্ব্ব অঙ্গ যেন তার শীতল ও স্থির হইয়া আসিতেছিল। প্রচুর পরিমাণে ঘাম হইতেছিল। সত্যেন্দ্র খুব ভাল করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ বুঝলাম আমার ডাক্তারীশিক্ষার কোন মূল্য নাই! নিজের ছেলের যে প্রাণরক্ষা করতে পারে না, সে কেমন করিয়া পরের জীবনরক্ষা করিবার স্পর্দ্ধা করে?"

মিনতি বলিলেন, "কি দেখ্‌লে? সতীশ কি বাঁচবে না? সতীশ, সতীশ, বাবা! কি করলি!" বলিয়া তিনি স্বামীর কোলের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সত্যেন্দ্র দেখিলেন, বিপদের উপর বিপদ! কোন প্রকারে মিনতির সংজ্ঞা আনয়ন করিলেন। তার পর বলিলেন, "তুমি যদি এত অধৈর্য্য হও, তাহ'লে সতীশকে কেমন করে রক্ষা করবে,বল?"

মিনতি মনে মনে, অনেক ঠাকুরের কাছে সতীশের জীবন রক্ষার জন্ত সম্ভব-অসম্ভব মানসিক করিতে লাগিলেন। সহসা তার সুপ্ত-স্মৃতি মথিত করিয়া একটা অতীতের স্মৃতি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে—পাওনাদারের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ও নির্ম্মমতা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র মিনতির বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। স্বামীর পা দু'টি জড়াইয়া ধরিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ওগো! আমি জীবনে কখন সত্য-ভঙ্গ করি নাই। কিন্তু, একটী সত্য আমার মনে ছিল না। তাই আজ সেই পাপে,—আমার পাপে, তোমার আদরের সতীশ আমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে! এ যে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! তখন কি জানি, শৈশবের বালিকা সুলভ সেই ক্ষুদ্র প্রতিজ্ঞা একদিন এমন নির্ম্মম হয়ে দেখা দিতে পারে? একটা অপরিণত বয়সের কল্পনা, যে এমন করে বেড়ে উঠতে পারে, এবং সে যে এমনি কোরে তার পরিসমাপ্তি করতে পারে, তা বোঝবার মত বুদ্ধি ত তখন আমার ছিল না।"

সত্যেন্দ্রনাথ মিনতিকে উন্মাদিনীর মত এত কথা কোনদিন বলিতে শোনেন নাই। তাঁহার ভয় হইল, পাছে পুত্রশোকে মিনতির মস্তিষ্ক না বিকৃত হইয়া যায়!

সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি মিনতিকে নিজ বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মিনতি তুমি কি ব'লচ?" ভগবানের দেওয়া দান, যদি ভগবান নেন তাতে তোমার আমার কি হাত আছে বল? তুমি যে কি বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"তুমি স্বামি, তুমি দেবতা, তোমার কাছে কোন দিন, কোন কথা গোপন করিনি। ছেলেবেলার সব গল্পই তোমার নিকট অতি তুচ্ছ হ'লেও—আমাব কাছে সেগুলা বহু মূল্যবান মনে করে, কতদিন তোমাকে শুনিয়েছি। কিন্তু, একটা কথা একেবারে ভুলে গিয়াছিলাম। একদিন খেলা ঘরে খেলা করতে করতে, পাকা গিন্নির মত কত অভিনয়ই করা হ'তো, সেদিন আমি আমার সইকে বলেছিলাম, "আমার প্রথম ছেলে বা মেয়ে যা হবে তাই সাগরকে দিব। কথটা মনে থাকলে, হয় ত আমি সাগরে আসতে ভয় পেতাম।"

"বুঝেছি! দেখছি, একটা ক্ষুদ্র সঙ্কল্প ও বিনা সিদ্ধিতে লয় হয় না মিনতি।"

আমাকে ক্ষমা কর। না বুঝে, এমন মতিভ্রম আমার ঘটেছিল। সত্যভঙ্গের পাপ থেকে আমাকে রক্ষা কর।"

সত্যেন্দ্র বলিলেন, "ভগবান যখন তার দান তোমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিয়ে তোমার সত্যকে বড় করতে চান, তখন এই যে প্রবল তরঙ্গ উন্মাদের মত ছুটে আসছে, এর মধ্যে নিশ্চয় আমাদের নৌকা ডুবে যাবে—তোমার সত্যপালন হবে!" কিন্তু মাঝি কৌশলে এবারও সে তরঙ্গের মুখ হইতে নৌকা বাঁচাইল। নৌকা ডুবিল না। সকলে সাগরের জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল।

মাঝি বলিল, "বাবু এই জায়গাটা বড় ভয়ানক। সাগরের মুখ! এখানটা একবার কোন গতিকে পার হ'তে পারলে আর ভয় নাই।"

হঠাৎ একটা মেঘ আকাশে দেখা দিল, বাতাস উঠিল। সাগর ভয়াল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ নৌকাখানিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার জন্ম সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। এবার কিন্তু মাঝি ভয় পাইল। বলিল, "বাবু একটু সাবধান হবেন। ভগবানকে ডাকুন, তিনি না রক্ষা করলে, আর উপায় দেখছি না। এটা হচ্ছে পরীক্ষা স্থান। সাগরের কাছে কোন দিন যদি কোন সত্য করে থাকেন, তা না পালন করলে, আমার জীবনে, অনেকবার দেখেছি, সাগর এমন করে রেগে উঠেন।"

মিনতির অত্যন্ত ভয় হইল। ভাবিলেন, আমার জন্ম কি আজ এতগুলি নিরীহ প্রাণীর প্রাণ যাইবে? তা কিছুতেই হইতে পারে না। বিদ্যুৎ-গতিতে সে সতীশকে দুই-হাতের উপর তুলিয়া ছুটিয়া নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন একটা প্রকাণ্ড ঢেউ লাফাইতে লাফাইতে সেদিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, দাঁড়ি-মাঝি এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া

উঠিল "নৌকা গেল, গেল"। সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া মিনতিকে দুইহাতে জড়াইয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। নৌকার উপর দিয়া তরঙ্গ চলিয়া গেল, নৌকা ডুবিল না সত্য, কিন্তু সতীশ নাই। ভক্তের দান ভগবান গ্রহণ করিয়াছেন।

মিনতির কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। মাঝি বলিল, "নৌকা আস্তে টান—একজন দাঁড়ি পড়ে গিয়েছে।"

সহসা যেন কোন যাদুমন্ত্রে সাগর শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। একটি তরঙ্গের মাথার উপর দাঁড়ি যেন উঠিয়া বসিয়াছে। সেইদিকে নৌকা পরিচালিত করা হইল; সত্যেন্দ্র যেন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে মিনতি অনেকটা সুস্থ হইয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয় ঢেউ দাঁড়িটাকে নৌকার অনেকখানি নিকটে আনিল। নৌকা হইতে মাঝি একটি দড়ী ফেলিয়া দিল। দাঁড়ি দড়ী ধরিয়া নৌকায় আসিয়া উঠিল, সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিল দাঁড়ি সতীশকে ভীষণ তরঙ্গের সহিত লড়াই করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছে।

মিনতির কাছে সতীশকে দিয়ে সে বলিল, "ছেলে পড়ে গেছে দেখে যেমন আমি ঢেউয়ের উপর পড়লাম, তখনি যেন কে আমার হাতে সতীশকে তুলে দিলে, আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠল। আমার গা যেন এখনও ছম্ ছম্ করছে।"

সতীশ বোধ হয় সমুদ্রের জল খাইয়াছিল; বা যে কোন কারণে হউক, সে সারিয়া উঠিল। মিনতির যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি চারিদিকে চাহিতেই, সত্যেন্দ্র বলিলেন, "সতীশ যে তোমাকে খুঁজছে?" মিনতির আগাগোড়া যেন একটা স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল। সতীশ তখন হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। নৌকা সাগর পার হইয়া গঙ্গার মুখে পড়িয়াছে।

সত্যেন্দ্র বলিলেন "ভাগ্যে সাগরে এসেছিলে মিনু, তাই আমার সতীশকে ফিরে পেলাম—আর তোমারও সত্য-রক্ষা হ'লো।

মিনতি সতীশের মুখ চুম্বন করিয়া স্বামীর পায়ের ধূলা লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "আর তোমার ডাক্তারীবিদ্যারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।"

পাথারের প্রেম

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

তুমি শুধু প্রাণে মনে জেনেছ আমায় ;
গোপনে মরম-তলে আঁখি প্রসারিয়া
দেখিয়াছ কি মণি সে গাঁথে ত্রিযামায়
রাখিয়াছ ওই তব হৃদয়ে ধরিয়া
প্রতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের বিঘটি তাহার
প্রতি ঘাত-প্রতিঘাত লহরী-মালায়।
তুমি তার লইয়াছ প্রতি আবেগের
সব ধ্বনি, সব সুর যতনে শিখিয়া
তুমি রাখিয়াছ তার বাণী সোহাগের
প্রেমের লিখনে তব মানসে লিখিয়া ;
স্পর্শে তার পূত বলি মানি আপনায়
করেছ গাহন তার আকুল ধারায় ;
সে অবাধ সলিলের অতল পাথারে
সব নিয়ে ঝাঁপ দেছ তুমি একেবারে।